প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীদেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১৫।২এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীশরৎচন্দ্র ভড়ে
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীপ্রণব শূর

দাম : ছয় টাকা

সর্পিল

এই লেখকের :

প্রেমের চেয়ে বড়
দ্বিতীয় প্রেম
অনুভার স্বপ্ন
ইত্যাদি

মোহেন্দ্র নারায়

দত্ত পাড়া



জেমনা

বহুলা

শ্রী-মন্ত জীবন কুমার দে

বিকেল থেকে তার মেজাজ খারাপ। আশ্বিনের বিকেল। কখন সূর্য ডুবে গেছে। তবু কিনা আকাশটা দগদগে ঘায়ের চেহারা নিয়ে লাল হয়ে আছে। হুঁ, পশ্চিমের আকাশ।

ঢেমনা মাছ ভাজছিল। রান্নাঘরের চৌকোণা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দুবার আকাশটা দেখেছে। দেখে চিন্তা করেছে, তার মনের ভিতরটাও এমন দগদগে ঘায়ের চেহারা ধরেছে।

আকাশ এখনি ঠাণ্ডা মেরে যাবে। লালটা আর থাকবে না।

কিন্তু, ঢেমনা চিন্তা করে, তার বুকের জ্বলুনি বাড়তেই থাকবে। হুঁ, যত অন্ধকার হবে, রাত বাড়বে, তার ভিতরের ঘা আরো বেশি দগদগে চেহারা ধরবে।

কড়ায় মাছ পুড়ে যায়। ছেঁচড়া গন্ধ বেরোয়। উনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অথচ হাতের কাছে তেলের শিশি রেখেও ঢেমনা কড়ায় তেল ঢালে না।

যেন ইচ্ছা করে চাকা চাকা মাছগুলিকে পুড়তে দেয়। চচ্চড় শব্দ হয়।

'এই ঢেমনা।'

ঢেমনা উত্তর দেয় না। চোয়াল শক্ত করে রাখে। হাতের খুন্তিটা দিয়ে উনের সামনের মাটি খোঁচায়। যেন ভিতরের রাগটা মাটি খুঁচিয়ে হজম করতে থাকে।

'মাছ পুড়ে যায়।' ওধার থেকে মেয়েলি গলার স্বরটা বেশ চড়া হয়ে উঠতে থাকে। 'এই ঢেমনা, উনের সামনে বসে ঘুম মারছিস

মনে হয়।' ঢেমনা চুপ করে থাকে। কড়াইয়ের লালচে রুইয়ের চাকা কালো রং ধরতে থাকে। চচ্চড় শব্দটা বাড়তে থাকে।

'এই ঢেমনা!'

যেন এবার ঘাড়েব উপর শব্দ হল। ঢেমনা চোখ তুলল, দাঁত খিঁচোলো।

'কি হল!'

'মাছ পুড়ছে!'

'সে আমি দেখব—আমার কামকাজ নিয়ে তোর কথা কওয়া ঠিক না।'

'মাছ পুড়ে যায়, কথা বলব না!' চড়া গলায় ঝাঁজ ছুটল। 'পোড়া মাছ বাবু খাবেন কি করে!'

ঢেমনা কথা বলল না। চোখ তুলল না। খপ করে তেলের শিশিটা তুলে নিয়ে কড়ার মধ্যে গদগদ করে এত তেল ঢেলে দিল। চচ্চড় শব্দটা চোখের পলকে মজে গিয়ে ডুবো তেলের মধ্যে মাছগুলি নাচতে আরম্ভ করল, পুটপাট পুটপাট শব্দ হতে লাগল।

'ইস, এত তেল ঢেলে দিলি!' পাতলা লম্বা শরীরটা দরজার চৌকাঠে ঠেকিয়ে কুন্তি রান্নাঘরের ভিতর গলাটা বাড়িয়ে দিল, ভুরু কপালে তুলল। 'কখানা মাছ ভাজতে এক শিশির তেল খরচ করে ফেললি!'

'বেশ করেছি, তুই এখান থেকে পালা।' ঢেমনা ইচ্ছা করে আর একটা চেলাকাঠ উনুনের ভিতর ঠেসে দিল।

'ইস করছিস কি!' কুন্তি আর্তনাদের মতন গলায় সুর করল। 'দপ দপ করে আগুন জ্বলছে, আবার একখানা কাঠ গুঁজে দিলি।'

'বেশ করেছি। আমার কাজ আমি দেখব, তুই উঠতে বসতে নাক গলাতে আসবি না।' কথাটা শুনে কুন্তির লম্বা নাকের ডগা কুঁচকে উঠল। হঠাৎ কথা বলল না। উনুনের সামনে উবু হয়ে বসা মানুষটাকে কটমট করে একটু সময় দেখল। কাঠের গুঁড়ির মতন

শুকনো ঝিরঝিরে দুটো হাঁটু, কপালটা উঁচু, লম্বা লম্বা চুলে কান কাঁধ ঢাকা পড়েছে, যেন কোনদিনই মাথার চুল কাটা হয় না, তেল দেওয়া হয় না, চিরুনি পড়ে না। গলায় পিঠে চাকা চাকা মাটি শ্যাওলার মতন চামড়া কামড়ে ধরেছে। ভাল করে চান করতেও বুঝি জানে না জোয়ান পুরুষটা। এত বড় বড় নখ হাতে পায়ে।

সব দেখে কুন্তি এমন চেহারা করল, যেন এখনি থুথু ফেলবে। তা অবশ্য ফেলল না, রান্নাঘর বলেই ফেলল না। চৌকাঠ থেকে শরীরটা আলগা করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'এই চেমনা, আমার দিকে তাকা।'

চেমনা তাকাল না। খুন্তি দিয়ে কড়ার মাছ উল্টাতে লাগল।

একটা ঢোক গিলল কুন্তি। হাত দিয়ে বেণীটা চেপে দিল। এই মাত্র চুল বেঁধে এসেছে। চোখে কাজল পরেছে। কপালে পাতা টিপ পরেছে। ফরসা একখানা শাড়ি পরেছে।

এবং যদি চেমনা চোখ তুলে একটু ভাল করে নজর করত তো দেখতে পেত, গায়ে গলায় খানিকটা পাউডার ছিটিয়ে দিতেও ছুঁড়ির ভুল হয়নি। এসব দেখতে হবে, আর দেখে বুকের আগুন নতুন করে চেতিয়ে উঠবে বলে চেমনা উনন থেকে মুখ তুলছিল না।

'এই চেমনা', গলা নরম করে কুন্তি আর একবার ডাকল।

চেমনা আর একবার দাঁত খিঁচোলো। একটা তেতো গেলার মতন ঢোক গিলল। তার ইচ্ছা করছিল, উনন থেকে একটা কাঠ তুলে পান পাতার মতন লম্বাটে মুখটায় ছেঁকা লাগিয়ে দেয়

হুঁ, অবিকল পান পাতার মতন মেয়েটার মুখের ঘের, চিবুকের দিকটা সরু, কপালের দিকটা ছড়ানো। চোখ দুটো বেশ দূরে দূরে বসানো, ছোট চোখ, চোখের ওপর দুদিক থেকে ভুরু দুটো এসে হঠাৎ এমন ভাবে থেমে গেছে—নাকের ওপর দিকটা কপালের কাছটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। তবে কিনা টিপ পরলে জায়গাটা ভরাট ভরাট দেখায়, তেমন খারাপ লাগে না, তা না হলে কপালের

নিচের ওই ভুরু মুছে যাওয়া জায়গাটা দেখলেই কেমন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ঢেমনার। প্রথম প্রথম তার ইচ্ছা করত মেয়েটার মুখটা টিপে দেয়—এমন খাপছাড়া ভুরু তার সহ্য হত না। এবং বেশিক্ষণ যাতে মুখটার দিকে তাকাতে না হয় তাই সে অন্য দিকে চোখটা সরিয়ে নিত।

'এই ঢেমনা!' চৌকাঠের এদিকে এক পা বাড়িয়ে দিয়ে কুন্তি রান্নাঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ঢেমনা মুখ তুলল না। উনন থেকে কড়া নামিয়ে ভাজা মাছের টুকরোগুলি বাটিতে তুলতে লাগল।

'এমন রেগে থাকিস তুই আমার ওপর সব সময়—।' কুন্তি চমৎকার অভিমানের সুর করল। 'যেন আমি কত অপরাধ করেছি।'

'তুই এখান থেকে সরে যা—আমার কাজ আমাকে করতে দে—' ঢেমনা এবার চোখ তুলল। টিয়া রঙের একটা নতুন জামা গায়ে দিয়েছে ছুঁড়ি। সাদা খোলের ধোয়া শাড়ি পরনে। আঁচলটা ভয়ানক চওড়া, তার ওপর একটু মুগার কাজ। তার মানে বেশ দামী শাড়ি।

অর্থাৎ, ঢেমনার বুঝতে আর বাকি রইল না। মাছ ভাজা পুড়ে যাচ্ছে, কড়াইয়ে এত তেল ঢালিস কেন—এসব বলতে মেয়েটা এখানে দাঁড়ায় নি, দাঁড়িয়েছে নিজের সাজসজ্জা দেখাতে। যা তার স্বভাব।

দিন দিনই এটা বাড়ছে। বাড়বার কারণ আছে যদিও। আর সেজেগুজে একবার ঢেমনার চোখের সামনে এসে দাঁড়াবেই।

আগে আগে ঢেমনা চোখ তুলে তাকিয়েছে। তবে তখন সাজ-গোজের এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না। মুখে পাউডার, চোখের কিনারে কাজল—এ সব একেবারে ছিল না। মাথায় চুলটা বেশি এবং বেশ কালো কোঁকড়া মতন চুল, কাজেই বেণীটা ঘটা করে সব সময়েই বাঁধা হয়।

হুঁ, জমকালো বেণীটা দেখাতে বা একখানা ভাল শাড়ি বা জামা গায়ে চড়ালে সেটা দেখাতে ঢেমনার সামনে এসে মেয়েটা দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এই দুমাসে তার সজ্জার ঘটা যে কত বেড়ে গেছে, ঢেমনা চোখের ওপর দেখল।

যাই হোক, গোড়ার দিকে ঢেমনার ভালই লাগত। সরলভাবেই সে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে।

কিন্তু ছুঁড়ি তার এই সরলতা রাখল কি? রাখল না। রাখত, যদি সে নিজে সরল হত। কিন্তু তা যে নয়, ঢেমনা দু-একদিনেই বুঝে গিয়েছিল। এবং কেন সরল নয়, কেন ভিতরটা এত বাঁকাচোরা, এখন ঢেমনার কাছে জলের মতন সহজ হয়ে গেছে। এ সব মেয়ে তাই হয়, তাদের ভিতরে পাকচক্র দুষ্টামি বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নেই। হুঁ, ঢেমনা তখন দেখত, সাদা মন নিয়ে সে একবারের জায়গায় দুবার ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে তো, ঠোঁটে মোচড় দিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ি হাসত, এমন নাক কুঁচকাত, যেন বলতে চাইত, আমার দিকে বেশি তাকাবি না, তাকালে তোর বুক জ্বলে যাবে, রাত্রে চোখে ঘুম আসবে না, খাওয়ায় অরুচি ধরবে।

এখন অবশ্য ওই মুখটার দিকে না তাকিয়েও ঢেমনার বুক জ্বালা করে, রাত্রে চোখে ঘুম আসতে চায় না—খাওয়ার রুচিটা পর্যন্ত চলে যায়, কিন্তু সে অন্য কারণে।

দু মাস ধরে কত কীর্তি সে চোখের ওপর দেখছে।

যাই হোক, ওই ঠোঁট মোচড়ানো হাসি আর নাক কোঁচকানো দেখে ঢেমনার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। তারপর যতই সেজেগুজে সামনে এসে দাঁড়াক, ঢেমনা জোর করে চোখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে, নয়তো হাতের কাজে মন দিয়েছে।

যেমন এখন। সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল, নতুন জামা দেখাতে, শাড়ি দেখাতে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দুষ্ট।

অথচ ঢেমনা যে কত বিরক্ত হয়, রাগ করে, তা-ও যে ছুঁড়ি না বোঝে এমন নয়, কিন্তু কথায় আছে, স্বভাব দোষ ছাড়ানো যায় না। বেটাছেলের সামনে সেজেগুজে শরীরটা একবার

হাজির করতে না পারলে এ সব মেয়ের পেটের ভাত হজম হয় না।

আজ ঢেমনার ইচ্ছা করছিল উননের একটা কাঠ তুলে ওই মুখটা ঠিক জ্বালিয়ে দেবে। পোড়া মুখটা নিয়ে আর কোনোদিন যাতে তার সামনে ন্যাকামো করতে না আসে।

'ঢেমনা!' কুন্তি আর এক পা কাছে এসে দাঁড়াল। ঢেমনা ভাজা মাছ ঢেকে রেখে নেমে ভাতের হাঁড়ি চাপাতে যাবে—ঠক্ করে হাঁড়ি হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। অ্যালুমিনিয়মের বাসন, শক্ত সিমেন্টের গায়ে ঠোকা লেগে তলার দিকটা বেঁকে তুমড়ে গেল।

'আহা, করলি কি!' কুন্তি হিস হিস করে উঠল। জিনিসপত্তর এত নষ্ট হয় তোর হাতে—এত ক্ষতি করিস তুই বাবুর—'

আর সহ্য হল না। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে উননের একটা কাঠ টেনে তুলে ঢেমনা কুন্তির দিকে রুখে গেল।

'অ্যাঁ, করিস কি, করিস কি—ওরে বাপ্—' কুন্তি একটা লাফ দিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে পাশের ঘরে ছুটে গেল। তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ওদিক থেকে ছিটকিনি তুলে দিল।

'তোকে ঠিক আমি পুড়িয়ে মারব। তোর মুখটা যদি একদিন জ্বালিয়ে না দিয়েছি আমার নাম সুবলচন্দর নয়।' হাতের কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সেটা শূন্যে উঁচিয়ে ধরে ঢেমনা দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে রীতিমত লাফাতে শুরু করল।

দরজার ওপাশ থেকে কুন্তি ভেঁচি কাটছিল। 'হুঁ, সুবলচন্দ্র না আর কিছু—ঢেমনা, ঢেমনা—যেমন চেহারা তেমন একটা বদখত নাম।'

'শয়তান মেয়েছেলে, বজ্জাত মেয়েছেলে নষ্ট মেয়েছেলে।' ঢেমনার ইচ্ছা করছিল লাথি মেরে কপাট ভেঙে ফেলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে। হুঁ, সুবলচন্দ্রের সঙ্গে তার আর একটা নাম, এই ঢেমনা নামটাও বাপ মা [illegible] খেয়াল করে না।

এই নিয়ে ওঘর থেকে বাজে মেয়েছেলেটা যতই টিটকারি দিক—তার রাগ আর এক জায়গায়, অন্য জিনিস নিয়ে। 'আর কোনোদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াবি তো লাথি মেরে তোর কোমর যদি ভেঙ্গে না দিয়েছি তো আমার নাম সুবলচন্দর না।' রেগে গেলে চেমনা কেমন ষাঁড়ের মতন গর্জন করতে পারে ওপাশে দাঁড়িয়ে কুন্তি বেশ টের পাচ্ছিল তা।

'গুণ্ডা, কলকাতা থেকে বাবু একটা গুণ্ডা ধরে নিয়ে এয়েছেন—কেন যে তোকে ধরে নিয়ে এল আর কেন যে থালা থালা ভাত গেলানো হচ্ছে আমি আজও বুঝতে পারলাম না।' কুন্তির গলাও কম যাচ্ছে না।

'তোর বাপের ভাত খাচ্ছি, তোর চৌদ্দ পুরুষের দানা গিলছি, ছোটলোক মেয়ে।' সব কটা দাঁত ছড়িয়ে দিয়ে চেমনা কপাটের এপাশ থেকে হাতের অগুনটা শূন্যে নাড়তে লাগল। 'তোর মুখের দিকে তাকালে থুথু ফেলতে ইচ্ছে করে, তোর গতরের দিকে চোখ পড়লেই মনে হয় ওখানে রাজ্যের পোকা কিলবিল করছে।'

'এই গতরের জন্যই তো রাতের বেলা তোর ছটফটানি শুরু হয়, চোখে ঘুম আসে না, এই মুখের জন্য চব্বিশঘণ্টা তোর জিভ থেকে লালা ঝরছে—'

'উহু, নর্দমা নর্দমা, দুর্গন্ধ—'

দুজনেই সমান জোরে চেঁচাচ্ছিল, হঠাৎ একসঙ্গে দুজনের গলা থেমে গেল। বাইরে মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। বাবু বাড়ি ফিরলেন।

রান্নাঘরের পিছনে ওদিকে বৈঁচি ঝোপের আড়াল থেকে টপ করে লাল রঙের গোল চাঁদ লাফিয়ে আকাশে উঠে গেল। ঢেমনা চুপ করে জানালায় দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখতে লাগল।

খুব যে মনোযোগ দিয়ে চাঁদটাকে সে দেখছিল তা নয়। প্রথম প্রথম এসব জিনিস দেখে সে খুবই অবাক হত। দুমাস আগের কথা। যেমন সকাল বেলায় হলদে রোদ, ঘাসের মাথায় মুক্তার মতন টলটলে শিশির, দুপুরের রোদে ঝিমানো আকাশ, দূরের আকাশে ভেসে যাওয়া চিল, রাত্রে অন্ধকার গাছপালার জটলা, খৈ ছিটানো তারার ঝিলিমিলি, এবং কোনোদিন রূপোর থালার মতন, ঝলসানো রুটির মতন চাঁদ। চাঁদ না থাকলে কালো থমথমে রাত, অথবা এক একদিন এই অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টির একটানা ঝমঝম শব্দ। অবাক হয়ে সব দেখত, কান পেতে শুনত। কিন্তু দুদিন না যেতেই সব কেমন পুরনো হয়ে গেল। যেন কিছুরই আর চমক থাকল না।

পাশের ঘরের ওই কুন্তি ছুঁড়ির মতন। সেজেগুজে হ্যাজাকের আলোর নিচে বাদলা পোকার মতন ছুটোছুটি করে বাবুর তোয়াজ করতে যে এখন উঠে পড়ে লেগে গেছে। হুঁ, বাবু খেতে বসেছে, কুন্তি পরিবেশন করছে।

না, নতুন কিছুই রইল না আর ঢেমনার শহুরে চোখ দুটিতে, বরং এসব দেখে তার এখন গা বমি বমি করে।

'এই ঢেমনা।'

ঢেমনা চমকে উঠল। চাঁদ দেখা হল না। ঘাড় ঘুরিয়ে দরজায় চোখ রেখে ভুরু কোঁচকাল।

'কি হয়েছে।'

'মাছের ঝোলে এত নুন দিয়েছিস!'

'কে বলেছে।' ঢেমনার চাপা গলা ফুঁসে উঠল।

'বাবু বলেছে, তোর মনিব।' চিকন দাঁত ছড়িয়ে কুন্তি হাসল। কেন না এখন আর গুণ্ডাটাকে ভয় নেই। বাবু ঘরে আছে।

এখন ঢেমনার লম্ফ ঝম্ফ একেবারে বন্ধ, ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছে না, উননের কাঠ তুলে কুন্তির মুখে ঠেলে দিতেও ছুটে আসছে না। সাপের মাথায় ধুলো পড়ার মতন চুপটি করে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এই জন্যই কুন্তি না হেসে পারল না। 'হুঁ, নুন কাটা হয়েছে বলে বাবু মাছের ঝোলটা মুখে তুলতে পারল না।'

ঢেমনা চুপ করে রইল।

'বুঝলি?' কুন্তি আবার বলল, 'বাবু বলেছে একটু সাবধান হয়ে রান্নাবান্না করতে।' কুন্তি ভুরু নাচিয়ে কথা বলল, যেন ঢেমনাকে এমন একটা উপদেশ দিতে পেরে তার ভাল লাগছিল।

'তুই যা, এখান থেকে সরে যা।' ঢেমনার মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠল। কোন রকমে সামলে নিল। চাপা গলায় বলল, 'হাতের পাঁচ আঙুল সমান না, পাঁচদিনই কিছু একরকম রান্না হয় না।'

বাটি হাতে করে কুন্তি বাবুর জন্য আরও ভাত নিতে এসেছে। 'হাঁড়িটা এদিকে বাড়িয়ে দে।' কুন্তি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

ঢেমনা কথা না বলে ভাতের হাঁড়ি কুন্তির সামনে ঠেলে দিল। কুন্তি হাতা ডুবিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত তুলতে লাগল। আঁচলটা আঁট করে কোমরে জড়িয়েছে। ঝোলানো বেণীটা পেঁচিয়ে ওপরের দিকে তুলে খোঁপার মতন করেছে। এবং ঢেমনা দেখল ইতিমধ্যেই, যেন বাবুর বাড়ি ফেরার ক' মিনিটের মধ্যেই মাথার চুলে দুটো বেলফুল গুঁজে নিয়েছে ছুঁড়ি। মানে সজ্জাটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়েছে। না কি বাবু নিজের হাতে ফুল দুটো ওখানে গুঁজে দিল। ঢেমনা ভাবতে লাগল। কুন্তি ভাতের বাটি তুলে নিয়ে দরজা থেকে সরে গেল। যাবার আগে একটা ঠোঁট মোচড়ানো হাসি ঢেমনাকে উপহার দিয়ে গেল।

এবার আর ঢেমনা তেমন একটা রাগ করল না। কেন না মোচড় দেওয়া ঠোঁটের হাসির চেয়েও মারাত্মক জিনিস এই মাত্র তার নজরে পড়ল। হুঁ, খোঁপায় ফুল।

যেন চিন্তাটা ধারালো ছুরি হয়ে তার বুকের ভিতর ফালা ফালা করে দিতে লাগল।

অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায়, বেহায়া মেয়ে কতখানি আস্কারা পাচ্ছে বাবুর কাছে। না, ঢেমনা ভাবল তার এই চিন্তাটাও খুব একটা ঠেলে দেবার নয়। বাবু হয়তো বাড়ি ফেরার সময় হাতে করে বেলফুল নিয়ে এসেছিল। ঘরে এসে খেতে বসার আগে ঐ বেড়ালের মতন ছোট্ট গোলগাল মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে দুটো ফুল গুঁজে দিয়েছে। কেনই বা অমন চিন্তা না করবে ঢেমনা। সাবান, স্নো, পাউডার, গন্ধ তেল, আস্তে আস্তে সব কিছুই আদায় করছে ছুঁড়ি বাবুর কাছ থেকে। শাড়ি জামা তো আছেই। তাও বেশ ভাল, দামী জামা কাপড়। বাড়ির বৌ-ঝিদের পরার মতন জিনিস।

কাজেই বাড়ির বৌয়ের মতন আহ্লাদ করে খোঁপায় ফুল গুঁজে দেওয়া বাকি থাকবে কেন।

বাকি কিছুই নেই। ঢেমনা সব টের পায়।

হাতের মুঠ পাকিয়ে শরীরটা শক্ত করে রেখে সে চাঁদটাকে দেখতে লাগল। ওদিকের তেঁতুল গাছের মাথায় উঠে গেছে। এখন আর লাল রুটির চেহারা নেই, তেল খাওয়া একটা রূপোর থালা হয়ে ঝকঝক করছে।

তবে কি ঢেমনা আবার শহরে ফিরে যাবে—যেমন ছিল সেখানে? রুটির গাড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিলোবে? বনজঙ্গলের দেশে এসে কলকাতার রাস্তার ছবিটাই এক একদিন নতুন করে দেখতে আরম্ভ করে সে। যেন ঐ জীবনটাই তার ভাল ছিল। বেলেঘাটার বস্তির

ছেলে। কলের ধোঁয়া, বাস শরীর ঘড়-ঘড়, গাড়ির ভিতর এক গাদা মানুষের হাসি কান্না হৈ-রৈ চিৎকার, রাস্তায় গিজ গিজ মানুষ। পাড়ায় বারোয়ারী দুর্গাপূজা, কালিপূজা, মাইকের আকাশ কাটানো শব্দ, আর এ সবের মাঝখানে খেয়ে না খেয়ে আঠারোটা বছর ঢেমনার একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠা। বারো বছর বয়স পর্যন্ত বেলেঘাটা চৌহদ্দীর মধ্যে ছিল। ডাংগুলি খেলেছে, ঘুড়ি উড়িয়েছে, খালের জলে মাছ ধরেছে, দাঙ্গা হলে শেয়ালদার রাস্তায় ছুটে গিয়ে ট্রাম বাস পোড়ানো দেখেছে। তারপর হঠাৎ একদিন বাবা মারা গেল।

রোগা একটা মানুষ। সারা মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। চেহারাটা পরিষ্কার মনে আছে ঢেমনার। শেয়ালদার ফুটপাতে বসে গামছা বেচত।

হুঁ, বাবা মরল আর ঢেমনাকেও তেরো বছর বয়সে রুজি-রোজগারের ধান্দায় শহরে বেরিয়ে পড়তে হল। বেলেঘাটার আকাশ বাতাস আর তাকে ধরে রাখতে পারল না।

শেয়ালদা থেকে আরম্ভ করে লালবাজার, লালবাজার থেকে আরম্ভ করে ভবানীপুর, ওদিকে বেহালা, উত্তরে বরানগর মাথার ওপর আকাশটা অনেক বড় হয়ে গেল। আর বাতাস। কত রকম বাতাস যে ঢেমনার গায়ে লাগল, আর বাতাসে ভর করে চলা কত রকম গন্ধ তার নাকে লাগল ভাবলে সে এখন অবাক হয়। চায়ের দোকানে চাকরি, হোটেলে বাসন মাজার কাজ, অ্যাসিড কারখানায় শিশিবোতল ধোয়া, কাঁধে সায়া ব্লাউজ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক'দিন ব্যবসা চালাবার চেষ্টা। হুঁ, বারুইপুর থেকে ঝিঙে বেগুন এনে বৈঠকখানার বাজারে বেপারীদের হাতে তুলে দেওয়া—অনেক কিছু করেছে সে, অনেক কিছু দেখেছে।

দেখতে দেখতে জীবনের কুড়িটা বছর পার হয়ে গেল। এখন তার বয়স একুশ। মুখে রোঁয়া রোঁয়া গোঁফ, দাড়িটা আর ভাল

করে গজাল না—হয়তো আর গজাবে না, ধরে রেখেছে সে। এই জন্য তার মাথাব্যথা নেই। অনেকেরই এমন হয়। রোঁয়া রোঁয়া গোঁফ, গালটা ছোট ছেলেদের মতন পালিশ নরম।

তা বলে শরীরটা নরম কি? কলকাতার রাস্তার রোদ বৃষ্টি ধুলো ধোঁয়া লেগে লেগে গায়ের চামড়া যেন পোড়া রং ধরেছে, তেমনি ঝামার মতন শক্ত হয়ে গেছে মাথা পিঠ গলা বুক।

হুঁ, বুকটা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে, গড়নটাও চমৎকার লম্বা হয়েছে। নাকটা উঁচু, চোখ মাঝারী।

না, এতকাল আরশীর সামনে দাঁড়ানো, কি মুখের সামনে আরশী ধরে নাক চোখ দাঁত মুখের হাঁ খুঁটিয়ে দেখার তার সময় ছিল না, সুযোগও ছিল না। এখন এখানে বাবুর বাড়িতে এসে নিজের চেহারাটা ভাল করে দেখে সে, দেখতে হয়। এই জন্য একটা হাত-আয়না যোগাড় করতে হয়েছে তাকে, গাঁয়ের হাট থেকে নিজের পয়সায় কিনে এনেছে। রাত্রে কাজ কর্ম চুকিয়ে তার ছোট শোবার ঘরে বসে কেরোসিনের লম্ফটা সামনে রেখে বালিশের তলা থেকে হাত-আয়না বার করে যখন মুখটা দেখতে থাকে, অনেক মুখ মনে পড়ে তার, এই কুড়ি একুশ বছরের জীবনে কত মুখ দেখল সে, কত নাক চোখ ভুরু। 'কিন্তু আমার এই চেহারা, এই শরীর?' ভাবতে থাকে ঢেমনা, 'পীরিত করার মত নয়?'

তখন সে মনে করতে চেষ্টা করে, ঢেমনা সতেরো বছর বয়স থেকে, মানে শরীরটা যখন ঢেঙা হতে শুরু করল, বুকের ছাতি একটু একটু করে ছড়াতে আরম্ভ করল, রোঁয়া রোঁয়া গোঁফ নাকের নিচে কালচে রেখা ফেলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, আর গলার স্বর বদলে গেল, ধর্মতলার চায়ের দোকানের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে সায়া ব্লাউজ কাঁধে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ঘোরাঘুরি শুরু হল; বেহালা, খিদিরপুর, শ্যামবাজার, বরানগর, উল্টাডাঙা, নারকেলডাঙা—হুঁ, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, আজ দুমাস ধরে না হয় এই বনজঙ্গলের দেশে একটা

বাড়িতে এসে ঠেক খেয়েছে, তা না হলে মেয়েছেলে সে কম দেখেছে? নাকি তারা কেউ তার দিকে তাকায়নি? না কি তাকিয়ে একবার দুবার ঠোঁট মোচড়ানো হাসি হেসে নাকের ডগা কুঁচকে তখনি আবার অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে?

মনে করতে পারে না, কিছুই মনে করতে পারে না ঢেমনা। তার সময় হয়নি কোনো মেয়েছেলের দিকে তেমন করে তাকাবার, তেমন করে কাউকে বিচার করার। তার শরীর দেখে, নাক চোখ চুল গায়ের রং দেখে, তাদের এক এক জনের চেহারা কেমন হত, ভাবতে গিয়ে আজ যেন অথৈ জলে পড়ে হাবুডুবু খায় সে। তাই হাট থেকে এই ছোট্ট আরশী কিনে এনে রাত্রে ঘরে বসে কেরোসিনের লম্ফ জ্বেলে মুখটা এত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা।

'আমার এই চেহারা, এই শরীর, কোনো মেয়েছেলের চোখে ভাল লাগল না?'

বিছানায় বসে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে সে ভাবতে থাকে। হয়তো আরশী নামিয়ে একসময় পাশে সরিয়ে রাখে। ফুঁ দিয়ে লম্ফটা নিভিয়ে দেয়। উঁহু ঘুম আসে না চোখে। বিছানায় শুয়ে চাঁদটাকে দেখে। হলদে চেহারা ধরেছে এখন। তেঁতুল গাছের মাথার ওপর দিয়ে এতবড় আকাশটা ডিঙিয়ে জানালার কাছে নেমে জ্বরো রুগীর মতন ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে চাঁদটা যেন তার দিকেই তাকিয়ে থাকে।

'এই ঢেমনা!'

ঢেমনা চুপ করে থাকে উত্তর দেয় না।

'কি হল, ঘুমিয়ে পড়লি।' দরজায় ঘা দেয় ছুঁড়ি। বাঁশের দরজা থরথর করে কাঁপে। 'কী মুশকিল, দোরটা খোল একবার, কথা আছে।'

'বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি।' ঢেমনা কড়া সুরে জবাব দেয়।

'একটি বার খোল্, আলোটা জ্বেলে নে।' নরম গলার কাতরানি, যেন গলে যেতে চাইছে বজ্জাত মেয়ে। ঢেমনা দাঁতে দাঁত ঘষে চুপ করে থাকে। এত রাত্রে হঠাৎ এখানে তার কী দরকার পড়ল, কিছুটা যে সে অনুমান করতে না পারে এমন না।

কাল সকালে রেলস্টেশনের বাজারে যেতে হবে, বাবুর সিগারেট ফুরিয়েছে, সিগারেট আনতে হবে, সেই কবে আবার হাট বসবে, হাটের জন্য বসে থাকলে চলবে না! হুঁ, সিগারেট, পাঁউরুটি, দাড়ি কামানোর ব্লেড যে কোনো একটা জিনিসের ফরমায়েস নিয়ে রাত দুপুরে তাকে জ্বালাতন করতে এসেছে মাগী। অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে যে কথা বললে চলত, যে কাজে পাঠালে চলত, সেটা এখনই এসে জানান না দিয়ে গেলে যেন চলছিল না দুষ্ট মেয়ের।

হুঁ, এখনই দরজা খোলো, আলো জ্বালো,—অর্থাৎ এই মাঝরাত্রে আর একবার, শেষবারের মতন আমার শরীরটা দেখে, সজ্জা দেখে, চুলের ফুল দেখে তুমি ভোররাত পর্যন্ত বিছানায় গড়িয়ে জ্বলতে থাকো।

'ঢেমনা!'

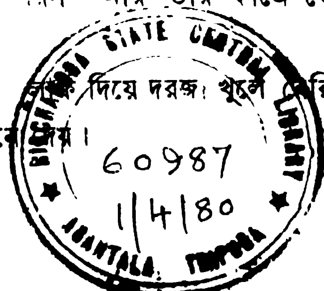
'হবে না, আমি এখন উঠতে পারব না।'

'বাবুর ফরমাস আছে।'

'কাল সকালে ফরমাস শোনা যাবে।'

'ইস, মনিবের খাস মনিবের পরিস—আর তার কাজে তোর আলসেমী!'

ঢেমনার ইচ্ছা করছিল একটা লাফ দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়, আচ্ছা করে বজ্জাতের চুলটা টেনে দেয়।



কিন্তু বাবু ঘরে আছে, হয়তো এখনো ঘুমোয়নি, চিন্তা করে দাঁতে দাঁত চেপে অন্ধকারে চুপ থেকে হাতের মুঠ দুটো পাকাতে লাগল। তার '।

'এই উঠলি ?'

ঢেমনা শুনল না। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছা করে নাক টেনে টেনে নাক ডাকার ঢং করতে লাগল।

কিন্তু ছুঁড়ি নাছোড়বান্দা। বাঁশের বেড়ার গায়ে আঁচড় কাটতে লাগল, আস্তে কিল দিয়ে থুপথুপ শব্দ করতে লাগল।

'আমি এখনই গিয়ে বাবুকে বলছি।'

'কি বলবি ?' ঢেমনার আর চুপ থাকা হল না।

'তুই একটা বেইমান, নিমকহারাম' বেড়ার গায়ে মুখটা চেপে ধরে কুন্তি হিস হিস করে উঠল। মনিবের খাচ্ছিস মনিবের পরছিস, আর তার কাজে তোর যত গাফিলতি— আলসেমী।'

'সারাদিনই খাটছি, অনেক কাজ করা হয়।'

কিছুতেই আর শুয়ে থাকা হল না, বিছানায় উঠে বসল ঢেমনা।

অন্ধকারে দরজার দিকে চোখ রেখে একটা একটা কাজের ফিরিস্তি দেয়। 'উঠোন ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, হাটবাজার করা, কাঠ কাটা, দুবেলা জল তোলা, রান্না, এঁটো সাফ করা, কুত্তার সেবা-যত্ন করা, ফুলগাছে জল দেওয়া—ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা, কত আর খাটা যায়।'

'যেন বসিয়ে খেতে পরতে দিতে আদর করে কলকাতা থেকে তোকে নিয়ে এসেছে তোর মনিব।'

কুন্তিও তার কাজের ফিরিস্তি দেয়। 'নাকি আমি বসে বসে খাচ্ছি। বাবুর জামাকাপড় গুছিয়ে রাখা, চানের জল গামছা এগিয়ে দেওয়া, বিছানা করে দেওয়া, পানটা জলটা হাতে তুলে দেওয়া, তার ওপর পাখার বাতাস, মশারী খাটানো, ঘর সাজানো—'

'তোর মাথায়', ঢেমনা সঙ্গে সঙ্গে কামড় বসিয়ে দিল। 'বাবুর জন্য খাটাখাটনি করে তোর লাভ ছাড়া লোকসান হচ্ছে না কিছু।

জাল শুকানো, গাব সেদ্ধ করা, জালে রং দেওয়া, মাছের পেট গেলে রোদে শুকিয়ে শুঁটকি করা, সব ছেড়েছুড়ে বাবুর কাছে এসে তুই মহাসুখে আছিস।'

দরজার ওপিঠ থেকে কুন্তি ফুঁসে উঠল। 'সুখটা কি শুনি! খাটছি তাই দুটো খেতে পরতে পারছি— তুই কিছু উপোস আছিস? না নেংটো হয়ে আছিস?'

ঢেমনা গলার নিচে হাসল। তার এই ঘিনঘিনে হাসি কুন্তিকে আরও চটিয়ে দিল।

'তাই তো বলছি, তুই বেইমান নিমকহারাম—'

'আমি শালা চাকর, চাকর হয়ে আছি—' অন্ধকারে ঢেমনা গলা খিঁচিয়ে উঠল। 'কিন্তু তুই আর চাকরাণী নেই—বিবি হয়ে আছিস, কোথায় জাল নিয়ে, মাছ নিয়ে বাপের ডেরায় দিন কাটছিল, গায়ের গন্ধে ভূত পালাত, এখন তোর গায়ে বাহারের শাড়ি জামা, মাথায় গন্ধ তেল—ছনো কিরিম পাউডারের ছড়াছড়ি, খোঁপায় ফুল।'

'তাই তো বলছি, তোর চোখ টাটায়, রাতদিন কেবল আমায় হিংসে, ভাল করে আমার দিকে তাকাতে পারিস না।'

'তোর দিকে চোখ রাখলে বমি আসে, গা জ্বালা করে, পেট গুলাতে থাকে—'

'ইতর ছোটলোক, শুনছি না কি, আমার কানে এসেছে সব, কলকাতার রাস্তায় কুত্তার মতন উপোস থেকে সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতিস।'

'হুঁ, তোর বাবার মুখে শুনেছিস সব, তোর নাঙের মুখে শোনা কথা—'

'গুণ্ডা, আমি এখনি গিয়ে বাবুকে বলব, কলকাতা থেকে পাকা বদমাস বাড়ীতে আমদানী করা হয়েছে। এখনি এটাকে তাড়িয়ে দিক।'

'তোর বাবুর নিকুচি করি।' ঢেমনা বিছানা থেকে লাফিয়ে দরজার

কাছে ছুটে গেল। 'রাত দুপুরে এসে জ্বালাতে আরম্ভ করেছিস—তোর মাথার সব কটা চুল যদি—'বলতে বলতে দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল।

কুন্তিও কিছু বোকা মেয়ে না, সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে গেল। উঠোনের ওপাশে লেবু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল। জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে ঝোপের নিচে কেমন অদ্ভুত লাগছিল ছিপছিপে মূর্তিটা। হেঁয়ালীর মতন ঠেকছিল, এভাবে এত রাত্রে তার ঘরের দরজায় এসে জোয়ান ছুঁড়ি গায়ে পড়ে ঝগড়া করছে, তাড়া খেয়ে ঝোপের তলায় ছুটে গিয়ে চাপা গলায় হাসছে।

কি চাইছে ও, কোন ফরমাস নিয়ে এসেছে বাবুর ?

'কি হল বল্ এখন কি করতে হবে।' ঢেমনা উঠোনে নেমে গেল। দুপা এগিয়ে এল কুন্তি।

'তোর ঘরে দেশলাই আছে, দুটো কাঠি দে, মাইরি আমার লম্ফটা নিভে গেছে, বিছানায় এত ছারপোকা।'

এইজন্য এত ভূমিকা। ঢেমনা হতভম্ব হয়ে গেল। একটু চুপ থেকে পরে গজগজ করে উঠল। 'তবে বলছিলি বাবুর ফরমাস আছে।'

'তা না হলে তুই দরজা খুলে বেরোতিস না যে।' কুন্তির গলায় অভিমানের সুর ফুটল। 'আমায় ছারপোকা কামড়াচ্ছে, ঘুমোতে পারছি না, ঘরে আলো নেই, দেশলাই নেই—শুনলে তোর ভালই লাগত।'

'হুঁ, তা তো লাগতই, অনেক সুখ পাচ্ছিস এ বাড়িতে এসে। দেখে আমার চোখ টাটায়, কাজেই মাঝেসাঝে যদি দুঃখ পাস, ছারপোকার কামড়ে ঘুমোতে না পারিস, শুনে ভালই লাগে—' মুখ বেঁকিয়ে ঢেমনা একদলা থুথু ফেলল।

'ইস, এত শত্রুতা করিস তুই আমার সঙ্গে!' কুন্তি আরো দুপা এগিয়ে এল। অথচ তোর দেশ এক জায়গায়, আমার দেশ আর এক জায়গায়। তুই কলকাতার রাস্তায় ঘুরে রুটি বেচতিস, আমি এই

গাঁয়ে বিলের ধারে বাবার ঘরে বসে গাব সেদ্ধ করে জাল রং করতাম, জাল শুকোতাম, মাছের পেট গেলে রোদে শুকিয়ে শুঁটকি করতাম। তুই আমায় চিনতিস না, আমিও তোকে চিনতাম না। বাবুর বাড়িতে তোর চাকরি হল, আমারও চাকরি হল। দুচার দিন বেশ ভালয় ভালয় কাটল, আমার সঙ্গে গল্পটল্প করলি, ভাব করলি, ওমা দু'টো দিন গেল না, তোর হিংসে আরম্ভ হল, জ্বলুনি আরম্ভ হল, আমায় দেখলেই তোর মেজাজ খারাপ, চোখ লাল—যেন হঠাৎ তোর কি ক্ষতি করে বসলাম, ভাবলে সময় সময় মনে এত কষ্ট হয়—'

'থাক আর ন্যাকামো করতে হবে না।' ঢেমনার মন এবারও গলল না। যেন জিবটা আরও শক্ত হয়ে উঠল। 'তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সামনে কখনো আসবি না, মাথা গরম করে কী করতে কী করে বসি ঠিক নেই।'

'ইস্ আবার সেই মেজাজ, ষণ্ডাগুণ্ডার মতন কথা—' কুন্তি যেমন দু'পা এগিয়ে এসেছিল, আবার দু পা পিছনে সরে গেল।

তেঁতুল গাছে পেঁচা ডেকে উঠল। এক ঝলক বাতাস উঠে গাছপালার সর সর শব্দ হল। বাবলা ঝোপের পিছনে চাঁদটা আরো খানিকটা ঢলে পড়েছে। বর্শার মতন চিকন এক ফালি জ্যোৎস্না লম্বা হয়ে কুন্তির পায়ের কাছে এসে ঠেকেছে।

উহুঁ, তখন সে বিশ্বাস করত না, পাখির মতন অমন সরু পাতলা নরম পা নিয়ে ছুঁড়ি বিলের ধারে ছুটোছুটি করে জালে রং দিত। এত বড় এক একটা জাল। একবারেই গোটা বিল ছেঁকে নেওয়া যেত। গাবের কষ মাখিয়ে ভাদ্রের গনগনে রোদে বড় বড় জাল মেলে শুকোতে দিয়েই কি মেয়ের ছুটি ছিল! তারপর শুরু হত হোগলার চাটাইয়ের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া পচা শোল, বোয়াল, লেঠার ওপর নাচানাচি করে নাড়িভূঁড়ি আলগা করা। মাছি ভনভন করত। রোদে গরমে লাল গাল বেয়ে কুলকুল করে বৃষ্টির মতন ঘামের ঢল নামত। উহুঁ তার পরেও জিরোনো চলত না, বাঁশের চটায় গেঁথে

নিয়ে পেট বার করা রাজ্যের মাছ খাড়া করে করে বিলের ধারে পুঁতে দিতে হত। হুঁ, সারাদিন রোদ লাগে এমন করে সার দিয়ে বাঁশের আগায় সব রাখতে হত। তারপর লগা হাতে নিয়ে কাক তাড়ানো, শকুন তাড়ানো, শেয়াল তাড়ানো। পাখির পায়ের সরু ছিপছিপে নরম পায়ে ছুটে ছুটে এত সব করা।

সত্যি, ঢেমনার বিশ্বাস হত না শুনে।

উঠোনের ওধারের লেবু ঝোপের ছায়ায় বসে কুন্তি গল্প করত। আর চোখ নামিয়ে নামিয়ে ঢেমনা তার ছিমছাম পায়ের পাতা দুটো দেখত।

তার ইচ্ছা করত পা দুটো কোলে নিয়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দেয়। কেন না ওই নরম পায়ের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। কথাটা ভাবলেও তার কষ্ট লাগত।

আর এখন?

সুন্দর পা দুটোর কাছে মাঝরাতের জ্যোৎস্না চিকচিক করছে দেখেও ঢেমনা চোখ সরিয়ে আনল।

উহুঁ, উঠোনেই আর দাঁড়াতে পারল না সে। ঘরে ঢুকে খটাস করে বাঁশের দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দেশলাইয়ের ক'টা কাঠি নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল।

না, ঢেমনা দেখল না। ঠোঁট টিপে কুন্তি হাসছিল আর নুয়ে নুয়ে কাঠি কুড়োচ্ছিল।

কিন্তু ঢেমনা যেটুকু দেখে এসেছে তাই যথেষ্ট।

তার মগজের ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। সরু হালকা পাখির পা থেকে ঘাসের গন্ধ, জল কাদার গন্ধ, শামুক গুগলি মাছের আঁসের গন্ধ অনেক দিন আগেই ধুয়ে মুছে গেছে। রোজ সাবান মেখে সে সব খারাপ গন্ধ দূর করতে ছুঁড়িকে কম বেগ পেতে হয় নি। তারপর তেল মেখে মেখে রোদে পোড়া, জলে দাগ ধরা পা একদিন মোমের পুতুলের পা হয়ে উঠল পালিশ চকচকে। ময়লার চিহ্নটুকু

রইল না। তারপর একদিন আলতার পোঁচ লেগে রাঙা বৌয়ের পায়ের মতন পা দুটো টুকটুক করতে লাগল।

ঢেমনা সব দেখছিল। দেখে চুপ করে থাকত।

আজ সেই পায়ে বাহারের চটি উঠেছে।

দুপুরে বাবু মোটরবাইক নিয়ে শহরে গিয়েছিল। আসবার সময় কী সব কিনে এনেছে ঢেমনা জানে না। শহরে গেলে বাবু এটা ওটা কিনে আনে।

তবে অন্য সব সওদার সঙ্গে এক জোড়া চটিও যে আজ আনা হয়েছে তাতে সন্দেহ ছিল না। আর সেই চটি পরে বজ্জাত দুপুর রাতে উঠোনে নেমেছে, ঢেমনার দরজায় এসে ঘা দিয়েছে। দেশলাইয়ের কাঠি চাই। তার মানে দোর খুলে বেরিয়ে এসে ঢেমনা দেখুক, আহ্লাদ করে বাবু আমাকে কী উপহার এনে দিয়েছে।

অন্ধকারে ঢেমনা ঠোঁট কামড়াতে লাগল। ভাবতে লাগল। তার খালি খোলা পায়ের পাতায় হাজারটা মশা হুল ফোটাচ্ছিল, খেয়াল ছিল না। একটা বড় ছোরা তার হৃৎপিণ্ডটাকে ফালা ফালা করছিল।

হুঁ, দূরের মানুষ কাছের মানুষ—ছোট বড় মাঝারি, কত রকম মানুষ তাকে দেখতে হয়েছে। অথচ বাড়ির কাছে তাদের বেলেঘাটার বস্তির খোয়া-ওঠা এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে মস্তবড় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ফি-বছর চৈত্রের শেষে আকাশে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হা-হা করে হাসতে থাকে, ঠিক তার পাশেই দক্ষিণ মুখো লাল রঙের চার তলা বাড়িটা। বাড়ির মানুষগুলিকে কোনদিনই যেন সে দেখতে পেত না। অথচ ওই বাড়ির ফুটফুটে

ছেলে, ছোটবেলায় যাকে নিমু বলে ডাকা হয়েছে, ফরসা নাতুশ নুতুশ চেহারা, একদিন রাস্তায় নেমে বস্তির ছেলে ঢেমনার সঙ্গে ডাংগুলি খেলেছে, ঘুড়ি উড়িয়েছে, চুপটি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে চাউলপট্টির সড়ক ধরে ঠিক ক্যানেলের পারে চলে গেছে। ঢেমনা বঁড়শী ফেলে লেঠা তুলত, নিমু চুপ করে পাশে বসে দেখত। পকেট ভর্তি করে বাদাম ভাজা নিয়ে গেছে বড়লোকের ছেলে, ঢেমনা যদি একবার ছিপটা নিমুকে ধরতে দিয়েছে, নিমু খুশী হয়ে এত বাদাম ভাজা ঢেমনার হাতে তুলে দিয়েছে।

হুঁ, সেসব দেখা ছোটবেলার দেখা সেদিনের মেলামেশা অন্যরকম মেলামেশা। যেমন বর্ষার মাঠের জল চারতলা দু'তলা খোলার ঘর টিনের ঘর একঘর হয়ে মিশে থাকে। কারো বাপ গামছা বেচে, কারো বাপ মোটর গাড়ি চড়ে বেড়ায়, কে নুন পান্তা খেল, কে ক্ষীর রসগোল্লা খেল বোঝা যায় না। বোঝা যায় তখন, যখন আর একটু বয়স বাড়ে। কার গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, কার গায়ে দামী লিনেন, কার পান্তা খাওয়া চেহারা, কার দুধ মাখন খাওয়া চকচকে শরীর, এক নজর দেখে তারা চিনতে পারে। যেমন বর্ষার জলভরা মাঠ আশ্বিনের শেষে খটখটে চেহারা ধরল। উঁচু নিচু এই গর্তে সেই গর্তে কোনটা খাল, কোনটা দীঘি, কোনটা নদী পরিষ্কার হয়ে গেল, সব কিছুর তখন একেবারে আলাদা চেহারা, তখন আর চারতলার ছেলে টিনের বস্তির ছেলের সঙ্গে মিশে ঘুড়ি ওড়ায় না, ডাংগুলি খেলে না। ছিপ ফেলে মাছ ধরে না। একজন আর একজনকে চিনতেই পারে না।

তাই বলা হচ্ছিল, সায়া ব্লাউজের বস্তা কাঁধে ফেলে ঢেমনা কলকাতার এই রাস্তা সেই রাস্তা এই গলি সেই গলি ধরে ঘুরত। হুস করে তার পাশ দিয়ে এতবড় একটা কালো মোটর চলে গেল, আর সেই গাড়ির ভিতর দামী জামা জুতো পরা ফরসা চেহারার সুন্দর মানুষটি বসে আছে।

হুঁ, নাম নিমাইবাবু, বেলেঘাটা চাউলপাট্টির রাস্তার কৃষ্ণচূড়া ফুল-

গাছওয়ালা জমকালো লাল বাড়ির সেই ছোট্ট নিমু, ঢেমনা চিনল না। নিমাইবাবুও চিনতে পারে না, একটা ফেরিওয়ালা যাচ্ছে, কলকাতা শহরে শত শত ফেরিওয়ালা রাস্তায় ঘোরে, গাড়ির জানলা দিয় মুখ বাড়িয়ে তার মুখটা চিনতে হবে এমন কি কথা। তবু তো ওটা ছিল নেবুতলার রাস্তা। বেলেঘাটার রাস্তায়, যেখানে দুজন একসঙ্গে বড় হয়েছে, একত্র ছুটোছুটি করে খেলাধূলা করেছে, কতদিন ধূপকাঠির প্যাকেট বগলে নিয়ে বা সায়া ব্লাউজের বোঁচকা কাঁধে ফেলে ঢেমনা হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে শেয়ালদার রাস্তা ধরেছে। নিমু গাড়ি ছুটিয়ে পাশ কেটে বেরিয়ে গেছে। কাউকে কেউ চেনে নি। দেখে নি। তাই হয়। ছোটবেলার চেনার সুতোটা একবার ছিঁড়ে গেলে, দেখাদেখির খেলা ভেঙে গেলে সেই সুতো জোড়া লাগতে চায় না, সেই খেলা আর যেন জমে না।

হুঁ, বিশেষ করে যেখানে খোলার বস্তি ও আকাশছোঁয়া চারতলা বাড়ি, যেখানে মোটর হাঁকিয়ে চলা, আর একজনের হাঁটাপথ।

কিন্তু ঈশ্বরের মনে সেদিন কি ছিল কে জানে!

জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে সন্ধ্যার দিকে। ফাল্গুন মাস। বৃষ্টি ধরল কিন্তু মেঘ কাটল না। তার ঝিরঝিরে একটা হাওয়া ছিল। ধর্মতলা হয়ে শেয়ালদার দিকে ফিরছিল ঢেমনা। নেবুতলার ভিতর দিয়ে সার্পেনটাইন লেন ধরে হাঁটছে। জল হয়ে পুরনো পীচের রাস্তা কেমন পিছল হয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় পা পড়লে ছপছপ শব্দ হচ্ছে। হয়তো আবহাওয়া তেমন সুবিধার ছিল না বলে, রাস্তায়, বিশেষ করে সার্পেনটাইন লেনের একটা গলির ভিতর লোকজন বড় একটা ছিল না। তাছাড়া একটু রাত হয়েছে যেন। ধর্মতলায় দু একজন মহাজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেখান থেকে বেরোতে একটু দেরী করেছিল ঢেমনা। আবার সঙ্গে কিছু কাপড়জামাও ছিল। তাড়াতাড়ি শেয়ালদায় পৌঁছে বেলেঘাটার বাস ধরবে বলে সে নেবুতলার ভিতর দিয়ে আসছিল। হুঁ, দেখল একটা কালো রঙের প্রাইভেট গাড়ি

তার পাশ কাটিয়ে সোঁ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বেশ জোরে গাড়িটা ছুটে গেল। একটা বাঁক ছিল ওখানটায়। কাজেই একবার এক নজর গাড়িটা দেখা গেল। তারপর আর দেখা গেল না। বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের লাল রঙটা অদৃশ্য হল। এমন কত গাড়ি আসছে কত গাড়ি যাচ্ছে, কে আর এই নিয়ে মাথা ঘামায়। রাস্তা পিছল ছিল, তাছাড়া পায়ে টায়ারের চপ্পল। ঢেমনা টিপে টিপে পথ এগোচ্ছিল। কিন্তু প্রাইভেট গাড়িটা সামনের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা একটা বিশ্রী কড়কড় আওয়াজ ওদিক থেকে ভেসে এল। যেন হঠাৎ জখম হয়ে একটা পশু বিকট শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠে তখনি আবার থেমে গেল। ঢেমনা অনুমান করল, গাড়িটা ব্রেক কষতে গিয়ে এমন আওয়াজ করেছে। এবং এও অনুমান করল, এই মাত্র কালো রঙের যে গাড়িটা তার পাশে দিয়ে চলে গেছে ওটাই কোনো অ্যাকসিডেন্ট বাধিয়েছে, অথবা অ্যাকসিডেন্ট এড়াতে গিয়ে জোরে ব্রেক্ কষেছে।

ঢেমনা একটু পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। বাঁক ঘুরতে সে দেখতে পেল তার অনুমান মিথ্যা হয়নি। কালো রঙের একটা গাড়ি একটা লাইট পোস্টের গায়ের উপর গিয়ে পড়েছে। গাড়িটা কাত হয়ে আছে। লাইট পোস্টের কিছুই হয়নি, কেবল তলার দিকে সিমেন্ট খানিকটা খসে পড়েছে, গাড়ির সামনের চাকা দুটো তখনো ঘুরছিল। হেডলাইট দুটোর একটা নিভে গেল আর একটি জ্বলছিল। এবং দেখা গেল, গাড়িটার কাছে গিয়ে সে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এদিকের অর্থাৎ গাড়ির যে পাশটা মাটি থেকে উঠে আছে, সামনের দরজা খুলে একটি পুরুষ কোনরকমে ঘাড় নুইয়ে শরীরটা কুঁজো করে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

মানুষটাকে ঢেমনা হঠাৎ ঠিক চিনতে পারে না। কিন্তু গাড়ির ভিতর আর একজন ছিল, একটি মেয়ে। যেন অবিবাহিতা মেয়ে। অল্প বয়স। গাড়ির ওধারের জানালার গায়ে মাথা কাত হয়ে পড়ে

আছে। চোখ বুজে আছে। মেয়েটির জ্ঞান ছিল কি না বোঝা যাচ্ছিল না। যাই হোক, ঢেমনা আর একনজর দেখেই পুরুষটিকে চিনল, কিন্তু তত চট করে বড়লোকের ছেলেটি চিনতে পারল না। কাজেই আগ বাড়িয়ে ঢেমনাকেই নিজের পরিচয় দিতে হয়েছিল।

এবং পরিচয় পাবার পর, সেখানে না, হাসপাতালের দরজায়, ঢেমনাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে নিমাইবাবু আবেগে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।

খুবই স্বাভাবিক। এমন একটা বিপদে ছোটবেলার একটি সাথী ছুটে এসে নানাভাবে সাহায্য করল—আর তা-ও কিরকম জায়গাটি, কেমন অবস্থায়, শহরের একটা ভদ্রপাড়া, এত রাত করে পাড়ার ভিতর দিয়ে মদ খেয়ে গাড়ি চালানো। গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের মুখ থেকে চড়া গন্ধ বেরিয়েছিল, এই জন্য আরো বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিল ঢেমনা—তা ছাড়া সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল, পাড়ার লোকে যদি চেপে ধরত, পরিচয় জিজ্ঞেস করত, তো তখন সদুত্তর দেওয়া নিমাইয়ের পক্ষে অসুবিধা ছিল, কোন আত্মীয়ের পরিচয় সেখানে খাটত না। হুঁ বান্ধবী, কিন্তু এ কোন্ জাতের বান্ধবী, পুরুষ মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে আর পাশে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে মেয়েটি। তবু রক্ষা, কোন মানুষকে চাপা দেয়নি নিমাই বা গাড়িটা কারো রোয়াকে বা দরজায় তুলে দেয়নি। তা হলেও এমন একটা বিশ্রী শব্দ শুনে কিছু লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। দু একজন চটাচটি করছিল, চোখ রাঙিয়েছিল, কেন না মুখের গন্ধটা তো কিছুতেই লুকোতে পারছিল না নিমাই। এভাবে এত রাত্রে একটা পাড়ার ভিতর গাড়ি নিয়ে ঢোকা, যেন কেউ কেউ পুলিশে খবর দেবার কথা বলেছিল--ঢেমনা হাত জোড় করে তাদের শান্ত করেছে, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং বৃষ্টি হয়ে রাস্তাটা ভিজে থাকার দরুণ যে গাড়ির চাকা পিছলে গিয়ে এমনধারা হয়েছে, একথাও

সে তাদের বুঝিয়েছিল। আর বার বার বলেছিল, তার পরিচিত মানুষ তো তার বন্ধু, বিশিষ্ট ঘরের ছেলে, এক পাড়ায় তারা থাকে।

তখন পাড়ার লোক কিছুটা শান্ত হয়। দু একজন সহানুভূতিও দেখায়। একজন ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনে। কেন না, নিমাইয়ের গাড়িটা বেশ ভাল জখম হয়েছিল। এদিকে মেয়েটির এই অবস্থা, জ্ঞান ছিল না, যেন মাথায় চোট লেগেছিল, নিমাইয়ের কপালের একটা পাশ কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। গাড়িটা পাড়ার মানুষদের জিম্মায় রেখে ঢেমনা তখনি দুজনকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে নীলরতন সরকার হাসপাতালে চলে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর নিমাইকে তখনি ছেড়ে দেওয়া হয়, মেয়েটিকে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে রাখা হয়।

হুঁ, তখন সেই রাত্রে হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে ঢেমনাকে জড়িয়ে ধরে কি করে যে নিমাই কৃতজ্ঞতা জানাবে ঠিক করতে পারছিল না। এবং একশোবার করে ঢেমনার কাছে ক্ষমা চাইছিল। তার ছেলেবেলার বন্ধু, এতকাল পর দেখা, আর এভাবে তাকে এতবড় একটা বিপদ থেকে বাঁচানো, অকপটে সব কথাই সে ঢেমনাকে বলে ফেলল। হুঁ, খুবই অপরাধ হয়েছে তার. ধর্মতলার একটা বার থেকে মেয়েটিকে নিয়ে শেয়ালদার একটা হোটেলে যাচ্ছিল, সেখানে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ঘর ভাড়া করে দুজন আনন্দ করত। আগেও দু একবার মেয়েটিকে নিয়ে সে বার-এ গেছে, হোটেলে ঘর ভাড়া করে দু'জন একসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়েছে। কিন্তু আজ যে এমন বিপদ ঘটবে যাই হোক, মন্দের ভাল, ঢেমনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এবং নিমাই আশা করছিল, এক পাড়ার মানুষ, ঢেমনা সবই জানল, কিন্তু পাড়ার কাউকে, কি নিমাইদের বাড়ির কারো কাছে এ সব কথা ঢেমনা কোনোদিন প্রকাশ করবে না, চেপে যাবে। 'তাই হবে, এজন্য তোকে ভাবতে হবে না, এতটাই যখন করলাম তখন এটুকু বিশ্বাস আমাকে করতে পারিস।' ঢেমনা তার

আ[...]ধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়েছিল। নিমাই নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নিমাইকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সেই রাত্রে ঢেমনা আবার সার্পেনটাইন লেনে ফিরে যায়। গাড়িটাকে রাত্রের মতন একটা গ্যারেজে রাখার ব্যবস্থা করে প্রায় রাত দু'টোর সময় সে বাড়ি ফেরে।

পরদিন নিমাই নিজেই এসে গাড়িটা ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এবং মেয়েটি নাকি পরদিন বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। আঘাত যে খুব একটা পেয়েছিল তা নয়, মাথায় একটু চোট লেগেছিল, সেই সময় গাড়িটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা নিমাইকে তাই বলেছিল। পরদিনই মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে নিজের ঠিকানায় ফিরে যায়।

তারপরেও সেই মেয়েটাকে নিয়ে নিমাই বার-এ হোটেলে যেত কিনা ঢেমনা আর জিজ্ঞেস করত না, বেশ একটু সঙ্কোচবোধ করত। সেদিন বেকায়দায় পড়ে সব কথা সে ঢেমনাকে বলে ফেলেছিল ঠিকই, তা বলে পরে আবার এই নিয়ে নিজে থেকে কিছু জানতে চাওয়াটা ঢেমনার রুচিতে বাধত। নিমাই এই ব্যাপারে একেবারে চুপ ছিল। ঢেমনাও চুপ থাকত। তবে দু'জনের দেখাদেখির মাত্রাটা বেড়ে গেল। এদিক থেকে অবশ্য নিমাইয়ের উৎসাহটাই বেশি ছিল। প্রায়ই সে হাঁটতে হাঁটতে ঢেমনাদের বাড়িতে চলে যেত, ঢেমনার সেই নোংরা ছোট ঘরে ঢুকে তার ময়লা বিছানার ওপর অকাতরে বসে পড়ে গল্প জুড়ে দিত, মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে দুজনে এক সঙ্গে চা খেত। আর নিমাই তখন প্রায়ই বলত, কলকাতা আর ভাল লাগে না, আর যেন এভাবে দিন কাটছে না, একটা কিছু করতে না পারলে যেন আর চলছে না।

তাই তো, কি করতে চায় সে। ঢেমনা চুপ করে শুনতো আর নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। ভাবত, বড় লোকের ছেলে। বাবার অগাধ পয়সা। কাঠের কারখানা, গেঞ্জির কারখানা এবং আরো একটা কিসের যেন ব্যবসা আছে তাদের। বাবা কাকারা

সে সব কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেখে। নিমাইকে কিছুই করতে দেয় না। তেমন লেখাপড়াও শেখেনি। মার কাছে চাইলেই হাত খরচের টাকা পায়। বাবার কাছে পায়। একমাত্র ছেলে। হঠাৎ সে কিছু একটা করতে চাইছে শুনে ঢেমনা অবাক হত; আবার হতও না, অর্থাৎ নেহাত গল্প করার জন্য এসব বলছে সে, ঢেমনা অনুমান করে নিত। কিন্তু না, যখনই দেখা হয়েছে তখনই নিমাই ঠিক একটা কথাই বলেছে, কলকাতা আর ভাল লাগছে না, বেলেঘাটা তো নয়ই—এখানকার আবহাওয়াই তার আর সহ্য হচ্ছে না, বিষের মতন মনে হচ্ছে, সব কিছুতে অরুচি ধরে গেছে। এখান থেকে পালাতে না পারলে সে শক্ত অসুখে পড়বে, নয়তো পাগল হয়ে যাবে।

তখন ঢেমনা চিন্তা করতে আরম্ভ করল।

নিমাইয়ের সঙ্গে বসে বেশিক্ষণ গল্প করা তার হয়ে উঠত না। খেটে-খাওয়া মানুষ সে। সায়া-ব্লাউজের ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছিল। সারাদিন বোঁচকা কাঁধে করে নিয়ে পায়ে হেঁটে এত ঘোরাঘুরি যেন তার সহ্য হচ্ছিল না। প্রায়ই শরীরটা খারাপ হত। ইদানিং বাগমারীর একটা পাঁউরুটির কারখানায় চাকরি নিয়েছিল সে। তাতেও যথেষ্ট ঘোরাঘুরি ছিল। তবে সাইকেল রিক্সার মতন একটা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে হত। দোকানে দোকানে এবং দরকার হলে বাবুদের বাড়িতে রুটি দিয়ে আসতে হত। কাজটায় হাঙ্গামা তেমন কিছুই ছিল না। সায়া-ব্লাউজের ব্যবসায় ঝুঁকি ছিল। প্রায়ই ধারে জিনিস বেচতে হত। আর সেসব দাম পরে আদায় করতে প্রাণ বেরিয়ে যেত। রুটির কারখানার চাকরিতে সে সব অসুবিধা ছিল না। কোম্পানির লোক এসে দোকানে দোকানে বিল দিয়ে রুটির টাকা তুলে নিয়ে যেত। ঢেমনার কাজ ছিল কেবল রুটি বিলি করা। সপ্তাহের শেষে মাইনে পেত। নিমাইদের বাড়িতেও রুটি দিতে আরম্ভ করল সে। নিমাই বাড়িতে বলে দিয়েছিল

যাতে ঢেমনার কাছ থেকে রুটি নেওয়া হয়। আগের রুটিওয়ালাকে রুটি দিতে বারণ করা হল। এখন রোজ সকালে ওবাড়ি রুটি দিতে গিয়ে নিমাইয়ের সঙ্গে তো দেখা হতই, নিমাইয়ের বাবার সঙ্গেও ঢেমনার দেখা হত, এবং একটা দুটো কথাও হত। ফরসা টুকটুকে চেহারার ছোটখাটো মানুষটি। খুব আস্তে কথা বলত। মাথার সব কটা চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। দেখলেই মনে হত অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ।

না, নিমাই সম্পর্কে বুড়োর সঙ্গে ঢেমনার তখন পর্যন্ত কোনো কথা হত না। ঢেমনাও তার কোন কিছু তুলত না, তাঁদের একমাত্র ছেলে নিমাই, শুনেছিল তার চারটি বোন আছে। তিন জনের বিয়ে হয়ে গেছে। একটি বোন এখনও ইস্কুলে পড়ে। ঢেমনার ছোট। রীনা। রীনাকে ঢেমনা চিনত। কৃষ্ণচূড়া গাছওয়ালা লাল রঙের চারতলা বাড়িটার সামনে বিকেল পাঁচটা বাজতে কালো রঙের একটা ঢাউস গাড়ি এসে দাঁড়ায়। পরীর মতন ফুটফুটে ফ্রক পরা মেয়েটি বইখাতা বগলে নিয়ে গাড়িটার থেকে লাফিয়ে নেমে বাড়ির ভিতর ছুটে যাচ্ছে, কতদিন এই দৃশ্য ঢেমনা দেখেছে।

এত বড় বাড়ি, ফুলের বাগান, পিছনে প্রকাণ্ড ফলের বাগান, দু-দু'টো গাড়ি, ঠাকুর চাকর দারোয়ান। এদিকে বুড়ো বাবা মা এখনো বেঁচে, কত বড় দু'টো কারখান নিজেদের, আদরের ছোট একটি বোন, যে-সব বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যেও একটি না একটি, প্রতি সপ্তাহে ছোট ভাইটিকে দেখতে আসছে—তাদের কারো কারো ছেলেমেয়ে হয়েছে, নিমাইকে দেখলেই ভাগ্নে ভাগ্নীরা মামা মামা করে আনন্দে দিশেহারা হচ্ছে, হুঁ, এত সুখ এত আনন্দ, এত সচ্ছলতা, এমন সুন্দর সাজানো সংসার, অথচ ভিতরে ভিতরে কী একটা যন্ত্রণা নিয়ে নিমাই ছটফট করছিল। কিছুই তার ভাল লাগছিল না।

ওবাড়ি রুটি দিতে আরম্ভ করবার পর থেকে জিনিসটা আরো

বেশি খারাপ লাগছিল ঢেমনার। সে ঠিক বুঝতে পারে না, কেন নিমাই এমন পালাই পালাই করছিল। কলকাতা তার ভাল লাগছিল না। বেশ তো, শহরে না বেরুলেই পারে সে, বেলেঘাটা ভাল লাগছে না, না-ই বা লাগল, কিন্তু এমন চমৎকার যার বাড়ি, বাড়ির সুখ শান্তি, আদর মমতা কমে গিয়েছিল বলে ঢেমনা একবারও কি ভাবতে পারত! কিন্তু বাড়িও নিমাইয়ের ভাল লাগছিল না। সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি, একটা উদাস উদাস ভাব নিয়ে ভুগছে।

এটা অবশ্য ঢেমনার নিজের ভাবনা, নিমাইকে সরাসরি এই নিয়ে প্রশ্ন করে নি, ঢেমনার যেন মনে হত, সেদিন রাত্রে সার্পেনটাইন লেনে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়ে নিমাই খুব দমে গিয়েছিল।

বাইরের লোক যেমন তেমন, তার ছেলেবেলার সাথী, এক জায়গায়, এক পাড়ায় থেকে যে বড় হয়েছে ঠিক তার কাছে সে এভাবে ধরা পড়ে গেল, তার চরিত্রের এমন একটা কালো দিক ঢেমনা জেনে গেল, যেন এই লজ্জা, এই দুঃখ কিছুতেই সে ভুলতে পারছিল না। অথচ তার সমবয়সী ঢেমনা, কত দুঃখ কষ্টে মানুষ, আজও কষ্টের শেষ হয়নি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বুড়ো বিধবা মাকে, ছোট দুটো ভাই-বোনকে খাওয়াচ্ছে। আর এত সুখে থেকে, এত নিশ্চিন্ত আরামের জীবন ভোগ করে কিনা নিমাই সংসারের অন্ধকার পথটাই বেছে নিল, লোকে শুনলে থুথু ফেলবে, নাক সিঁটকোবে, এমন জিনিষ নিয়ে সে মেতে রইল—।

কাজেই নিজের ভিতর একটা ঘেন্না আসতে পারে, আরামের সুখের জীবন আর সে চাইছে না, অন্য জীবন চাইছে। সংসারের প্রায় সব মানুষই কাজ করছে, খেটে খাচ্ছে, বেঁচে থাকার জন্য সবাই কষ্ট করছে, যেন নিমাইও এখন থেকে তাই চাইছিল একটা কিছু করবে সে, একটু কষ্ট ভোগ করবে।

আর ঢেমনা যখন পুরোপুরি তাকে জেনেই গেছে, তখন এই

মানুষটির কাছেই ভিতরের যন্ত্রণার কথা, ছটফটানির কথা বলে সে হয়তো শান্তি খুঁজছিল।

অবশ্য এর সবটাই ঢেমনার অনুমান। এখন আসলে নিমাইয়ের মনে অনুতাপ এসেছিল কিনা, না কি, যেহেতু ঢেমনা তার চরিত্রের অন্ধকার দিকটা দেখে ফেলেছিল, এইজন্য বন্ধুকে খুশী রাখতে এবং তার সম্পর্কে ঢেমনা আর যাতে কোনরকম খারাপ ধারণা না রাখে তাই তার কাছে রোজ এসব কথা বলত, ঢেমনা ঠিক বুঝতে পারত না। অর্থাৎ উল্টো দিকটাও সে সন্দেহ করেছিল। আবার ঢেমনা এ-ও চিন্তা করত, যদি তাকে খুশী রাখতে, তার মন ভোলাতে নিমাই এসব বলবে, তো একদিনের বলাই তো যথেষ্ট, রোজ রোজ কেন এসব কথা বলতে আসবে। নিশ্চয় এই জীবনটার ওপর, সেই সঙ্গে বাবা-মা বাড়ি-ঘর, এই বেলেঘাটা, এই কলকাতা শহরটার ওপর তার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। চাইলেই বাবা-মার কাছে টাকা পাওয়া যায়, আর সে টাকা খরচ করার রাস্তার অভাব নেই কলকাতা শহরে, পকেট থেকে টাকা বার করলেই মেয়েছেলে এসে জোটে, পা পাড়ালেই মদের দোকান, দু'ঘণ্টা ফুর্তি করার মতন কামরা ভাড়া পাওয়া যায়, এমন শ'য়ে শ'য়ে হোটেল এই শহরের মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। কাজেই এখানে আর না।

নিমাই তার যন্ত্রণার কথা বলত, ঢেমনা শুনত। শুনে চুপ করে থাকত। এ ছাড়া আর কী করতে পারত সে। এমন টাকাওয়ালা বাপের ছেলে, সে কাজ করতে চাইছে, কষ্ট করতে চাইছে—তাকে কি পরামর্শ দিতে পারত ঢেমনা। ঢেমনার মতন রোদে জলে ঘুরে রুটির গাড়ি চালাত নিমাই? নাকি ধূপকাঠির প্যাকেট নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত।

তা না হয় ঘুরল। কিন্তু এই বেলেঘাটা, এই শহরটাই যে তার কাছে বিষের মতন ঠেকছে। এখানে কাজ নিয়েও তো আটকে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

বলতে কি, নিমাই যেমন মনের অশান্তি নিয়ে ভুগছিল তেমনি আবার নিমাইয়ের কথা চিন্তা করে ঢেমনাও ভিতরে ভিতরে কম অশান্তি পাচ্ছিল না।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন নিমাইয়ের মুখে হাসি দেখা দিল। যেন তার চোখের রং আবার ফিরে এসেছে, চেহারাটা চকচক করছে। কি ব্যাপার? ঢেমনার ঘরে ঢুকে তার ময়লা বিছানার ওপর সিল্কের জামা কাপড় নিয়ে নিজেই বসে পড়ল আর ঠোঁট টিপে হাসতে আরম্ভ করল।

ঢেমনা অবাক। ক'দিনের মধ্যে নিমাইকে এত হাসিখুশী দেখেনি সে। যেন এতদিন পর সে একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে, আলোর সন্ধান পেয়েছে, আর তাকে অন্ধকারে মুখ গোমড়া করে বসে থেকে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলতে হবে না।

'কি হল', ঢেমনা একটু ঠাট্টার সুরে বলল, 'আজ যেন অমাবস্যার আকাশে চাঁদ উঠছে?'

'তোকে এখনি আমাদের বাড়ি যেতে হবে—বাবা ডাকছে।'

'বুড়ো কর্তা!' ঢেমনা ঢোক গিলল। 'হঠাৎ আমাকে?'

'হুঁ', বড় বড় চোখ দুটো ঢেমনার মুখের ওপর একটু সময় ধরে রেখে নিমাই কী যেন ভাবল, তারপর আবার হাসল, শব্দ করে হাসল। 'আর এই বেলেঘাটার নরকে থেকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না।'

'কোথায় যাচ্ছিস, বাইরে কোথাও চাকরি-টাকরি নিয়েছিস নাকি?'

'ব-কলম—আমায় চাকরি দেবে কে!' ঢেমনার পিঠে আস্তে একটা চাপড় বসিয়ে নিমাই ছোট করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'হুঁ, তবে কারো বাড়িতে চাকরি করার কথা যদি বলিস, তা পারব, বাসন-মাজা জল-তোলা বা হোটেল রেঁস্তোরায় বয়গিরি।'

'ফাজলামো রাখ। বুড়ো কর্তা আমায় কেন ডেকেছেন শুনি?'

'আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'আমাদের দেশের বাড়িতে।'

'বেড়াতে যাচ্ছিস নাকি সেখানে. ক'দিন থাকবি?' ঢেমনা খুশী হল।

নিমাই মাথা নাড়ল।

'ক'দিন না, পাকাপাকিভাবে সেখানে থেকে যাব—তাই ঠিক হয়েছে, বাবা রাজি হয়েছে।'

একটু চিন্তা করে ঢেমনা বলল, 'তা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছিস কেন, রুটির কারখানায় নতুন চাকরি নিয়েছি, খুব বেশি দিন তো সেখানে গিয়ে থাকতে পারব না।'

'ওফ!' নিমাই ভুরু কোঁচকালো। 'রুটির কারখানার চাকরিটা তোর কাছে খুব বড় হয়ে গেল—তুই বাবার সঙ্গে কথা বল, বাবা তোকে যা বলার বলবে।'

ঢেমনা আবার একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তোদের দেশের বাড়ি যেন কোথায়?' রুটি দিতে গিয়ে বুড়োকর্তার মুখে একদিন কথাটা সে শুনেছিল। এখানে তাজা মুর্গির ডিম যোগাড় করার অসুবিধা হচ্ছে। কর্তাবাবুকে ডাক্তার রোজ একটা করে ডিম খেতে বলে দিয়েছে। তাই বুড়ো সেদিন দুঃখ করছিল, তাঁর দেশের বাড়িতে কত হাঁস মুর্গি, দেখবার শুনবার লোক নেই, কত ডিম নষ্ট হচ্ছে।

'হুঁ, বেশি দূরে না।' নিমাই বলল, 'কলকাতা থেকে ট্রেনে এক ঘণ্টার রাস্তা। বারাসতের নাম শুনেছিস?'

ঢেমনা ঘাড় কাৎ করেছিল।

নিমাই বলল, 'বারাসতের দু'স্টেশন পরেই আমাদের দেশের বাড়ি।'

অ, তাহলে এমন হতে পারে, ঢেমনা তখনই আবার চিন্তা করল, নিমাই এই প্রথম সেখানে যাচ্ছে, রাস্তাঘাটের গোলমাল হতে পারে, তাই বুড়ো কর্তা ঢেমনাকেও সঙ্গে যেতে বলছে। নিমাইকে সেখানে পৌছে দিয়ে ঢেমনা ফিরে আসবে।

'তুই আর কোনোদিন সেখানে গিয়েছিস?' ঢেমনা প্রশ্ন করল।

'গিয়েছি বৈ কি।' নিমাই চোখ বড় করল। 'চমৎকার জায়গা, তবে খুব ছোটবেলায় গিয়েছিলাম, বাবার সঙ্গে একবার, কাকার সঙ্গে একবার—বড় হয়ে আর যাওয়া হল কোথায়!' একটু থেমে থেকে আবার সে বলল, 'এসব জায়গার তুলনায় সেখানটা স্বর্গ। কত গাছ, কত বড় বড় মাঠ, অফুরন্ত রোদ, সারাক্ষণ হু হু হাওয়া। শরীর মন আপনা থেকে ঝরঝরে হয়ে যায়।'

'তা তো হবেই, পাড়াগাঁর সঙ্গে শহরের, বিশেষ করে এই বেলেঘাটা কলকাতার তুলনা হয় নাকি, নোংরার ডিপো, তেমনি ঘিঞ্জি—একটা গাছের পাতা ভাল করে চোখে পড়ে না।'

ঢেমনা বড় করে নিশ্বাস ফেলেছিল।

'তাই আমি ঠিক করেছি দেশে গিয়ে থাকব, আমাদের জমিজমা সেখানে কম না। চাষবাসও হয়, সে সব কাজের জন্য লোক আছে, তবে একজন গিয়ে সেখানে থাকা দরকার, নিজেরা দেখাশোনা না করলে কোন কাজই তেমন ভালভাবে হয় না, তাছাড়া জিনিসপত্র চুরি যায়, নষ্ট হয়। আমি সেখানে গিয়ে থাকব শুনে বাবা খুব খুশী, তখনি রাজি হয়ে গেল।'

'তা তো হবেনই।' ঢেমনা মাথা নাড়ল। 'তাছাড়া ঘরদোরও সেখানে খালি পড়ে আছে নিশ্চয়ই? মানুষ না থাকলে বাড়িও নষ্ট হয়ে যায়।'

'তা হচ্ছে বৈ কি। কত বড় শোবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, স্নানের ঘর সবই করা হয়েছিল, আমরা ভাইবোনেরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাবা মা সেখানে মাঝে মাঝে থাকত, পনেরো দিন একমাস কাটিয়ে আসতাম আমরা। তারপর আর যাওয়া হয়ে উঠত না। এখানে বাবার কাজ বেড়ে গেল, দু-দুটো কারখানা দেখাশোনা করার পর তাঁর আর দেশে যাতায়াতের

সময় হত না। কাকারা অবশ্য এখনো মাঝে মাঝে যান। তাঁরা তাঁদের হিসাবে দেখাশোনা করেন।'

'তা মন্দ কি, তুই এখন বড় হয়েছিস, তুই গিয়ে তোদের জমিজমা, বাড়িঘর ছাখ, খুব ভাল কথা।'

'তা ছাড়া একটা বড় বিল আছে ওখানে। অনেকদিন থেকে বাবার ওটা কেনার ইচ্ছা, কিন্তু বাবা সময় পায় না, তা বিল কিনে ফেলে রাখলে তো কাজ হয় না, বাবা বলল, আমি যদি ওখানে যাই তো ওটা এখনি কিনে নেওয়া হবে। মাছের চাষ করব আমি, যাকে বলে ফিশারী—খুব চমৎকার হয়, তাই না?' নিমাই চোখ নামাল।

ঢেমনা মাথা ঝাঁকাল, 'করতে পারলে খুবই ভাল, এ দিনে মাছের ব্যবসার মতন এমম লাভের ব্যবসা আর হুটো হয় না।'

'করব, একটা কিছু করতে চাইছি আমি—তোকে বলেছি, এখানে আর এক দণ্ড আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমার মনে হয় এই বেলেঘাটার বাড়িতে থাকলে আমি মরে যাব।'

ঢেমনা আর কিছু বলছিল না। নিমাই থেমে থাকল না। 'কিন্তু একটি মানুষ সঙ্গে চাই—বন্ধু, কর্মচারী—যা-ই বলিস, তা না হলে অত নির্জনতার মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠব, তা বলে কি আর সেখানে মানুষ নেই, আছে সব চাষী, জেলে, তাদের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলা যায়, প্রাণের কথা বলার মতন একজন সঙ্গীর দরকার।'

এবার ঢেমনা হেসে ফেলেছিল।

'তেমন একটি সঙ্গী বাছতে গিয়ে কি তুই শেষটায় আমাকে বেছে নিলি?'

'নিশ্চয়। তোর মতন এত বড় বিশ্বাসী বন্ধু আমার আর কে আছে বল, আমরা একসঙ্গে এক জায়গায় বড় হয়েছি; ডাংগুলি খেলেছি, হুজনে এই বেলেঘাটার খালের জলে মাছ ধরেছি, ঘুড়ি উড়িয়েছি—তোর কথাই আমি বললাম, বাবা এক কথায় রাজি হয়ে গেল।'

ঢেমনা আবার চুপ করে রইল। হাতের নখ খুঁটছিল সে তখন। যেন কথাটা চিন্তা করছিল।

নিমাই বলল, 'তোর কোনো রকম অসুবিধা হবে না সেখানে, এইজন্য আমি দায়ী রইলাম। এর মধ্যে চিন্তা করার কিছু নেই। রুটির কারখানায় তুই চাকরি করছিস, না হয় আমার কাছে থেকে গেলি, হুঁ আমার কর্মচারী—আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে সেখানে আমার সঙ্গে থাকবি—তা বলে তোকে যে একটা সাধারণ কর্মচারীর মতন দেখব তা কক্ষনো মনে করিস না—অন্ততঃ এই ভুল ধারণাটা আমার সম্পর্কে করবি না। এখানে যেমন তুই আমার বন্ধু, সেখানেও বন্ধু হয়েই থাকবি। আর হুঁ, টাকাকড়ি—সেটা বাবা তোকে বলবে, অমার তো মনে হয় রুটির কারখানায় তুই এখন যা পাচ্ছিস তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম দেওয়া হবে না তোকে—আর খাওয়া দাওয়া তো আমার সঙ্গেই হবে--'

'তুই থাম তো :' যেন ঢেমনা ধমক দিয়ে উঠল। 'টাকাকড়ির কথা আমি বলেছি নাকি—'

'আহা, তুই বলবি কেন, সেটা আমি দেখব,—টাকাকড়িটাই তো এখানে আসল, এখানকার চাকরি ছেড়ে আমার সঙ্গে যাচ্ছিস—এখানে তোর মা ভাই বোনেরা রইল, তাদের কথা চিন্তা করতে হবে না? তারা এখানে খাবে কি?'

ঢেমনা আর কথা বলছিল না।

নিমাই বলল, 'তোর কথা পেলেই আমি এদিককার কেনাকাটা সেরে ফেলি। দুটো মানুষ এক জায়গায় গিয়ে বাস করছি, বিছানাপত্তর, বাসনকোসন সব কিছুই লাগবে। আর আমি কি ঠিক করেছি জানিস? একটা মোটর-বাইক কিনে ফেলব। এটা ওটা টুকিটাকি অনেক কিছু দরকার হবে সেখানে। অজ পাড়াগাঁ, হপ্তায় একদিন হাট, কিন্তু তার জন্য তো বসে থাকলে চলবে না—তখন মোটর-বাইক চালিয়ে সাঁ করে বারাসতে ঘুরে আসা যাবে।

আধঘণ্টা কুড়ি মিনিটও লাগবে না। ছুট করে মনে কর সিগারেট ফুরিয়ে গেল, কাপড় কাচার সাবান নেই—হাটের দিনের জন্য হাঁ করে বসে না থাকলেও আমাদের চলবে।'

এবার ঢেমনা শব্দ করে হাসল।

'ছক কেটে এখন থেকেই সব ঠিক করে ফেলেছিস। তা একটা মোটর-সাইকেল কিনতে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে যাবে।'

'যাবে, তা আর করার কী—যেটার দরকার সেটা কিনতেই হবে। এই জন্য বাবা টাকা দিতে পেছপা হবে না।' অবার একটু হাসল নিমাই। 'চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে আমরা গাঁয়ের ওই বিলটা যখন কিনে নিচ্ছি তো সেখানে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ করে আমায় একটা মোটর-বাইক কিনে দিতে বাবা নিশ্চয়ই পরোয়া করবে না, বুঝতে পারছিস, আমি ওটা দেখাশোনা করব, ফিশারী করব শুনে বাবা এত খুশী হয়েছে —'

তাই তো! ঢেমনা ঢোক গিলল। কত টাকার মালিক নিমাইয়ের বাপ! একটা মোটর-বাইকের টাকা কিছুই না তাদের কাছে।

'যাক গে তুই তো এখন কাজে বোরোচ্ছিস।' হাতের ঘড়ি দেখে নিমাই উঠে দাঁড়াল। 'আমি চলি, বিকেলে বাবার সঙ্গে দেখা করবি।'

বিকেলে বুড়ো কর্তার সঙ্গে দেখা করেছিল ঢেমনা। ছোটখাটো সুন্দর মানুষটি অমায়িক মিষ্টি হেসে অনেক কিছু বলেছিল, অনেক কিছু বুঝিয়েছিল ঢেমনাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুড়ো আর হাসছিল না, গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, গলার স্বরও কাঁপছিল, তারপর হঠাৎ মুখটা কেমন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল, গলার স্বরটা আরো বেশি কেঁপে উঠল। তখন, হুঁ, ঠিক তখনই ঢেমনার হাতদুটো জড়িয়ে ধরল এতবড় মানুষটা। 'তুমি তার সঙ্গে থাকবে, তাই সাহস পাচ্ছি খোকাকে পাঠাতে। তার সাংসারিক জ্ঞান বলতে গেলে কিছুই নেই—কদিন ধরে বাড়িতে মনমরা হয়ে থাকতে দেখতাম, সেদিন হঠাৎ বলল, দেশে

গিয়ে থাকবে, আমি না করলাম না, একটা কিছু করতে চাইছে, বিলটা এমনিও আমি কিনতাম, যদি ও মাছের চাষ করে, অবশ্য কতটা করতে পারবে জানি না, তা হলেও একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকা ভাল। কিন্তু একলা পাঠাতে কিছুতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না, তারপর যখন তোমার কথা বলল, আমি মনে জোর পেলাম—কাজেই বুঝতে পারছ বাবা, একমাত্র তোমার ওপর ভরসা করে নিমুকে সেখানে পাঠাচ্ছি, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, একপাড়ার মানুষ, দুজন একজায়গায় বড় হয়েছ, তোমার ছেলেবেলার সাথী সে, তার ভালমন্দ তুমি যতটা দেখবে, এমন আর কেউ দেখবে না। ভাবব, আমার আর এক ছেলে নিমুর সঙ্গে দেশে আছে, হুঁ, নিমুর একটি ভাই—কাজেই দু'ভাই যেখানে একত্র আছে, আমার আর দুশ্চিন্তা করার কিছুই রইল না।'

'আমি যদি সঙ্গে থাকি, নিমুর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।' ঢেমনাও বেশ বড় গলায় সেদিন বুড়োকে আশ্বাস দিতে পেরেছিল।

'হুঁ, তুমি সঙ্গে থাকবে, তুমি নিমুর সঙ্গে যাবে। এটা আমার অনুরোধ বাবা। এ বিষয়ে কিন্তু আর দ্বিমত করো না। খোকা যখন একটা কিছু করতে চাইছে, করুক, তোমার বেলেঘাটার বাসার জন্য চিন্তা করতে হবে না। এখানকার খরচপত্র চালাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার—আর সেখানেও হাত খরচের জন্য তোমার যখনই টাকার দরকার হবে নিমুর কাছ থেকে চেয়ে নেবে।' একটু থেমে থেকে বুড়ো বলেছিল, 'রান্নার জন্য একটি লোকের দরকার, এখান থেকে লোক নিয়ে গেলে অনেক টাকা মাইনে চাইবে, বরং ওখানেই তোমরা কাউকে ঠিক করে নিও, বয়স্থা বিধবা অথচ গরিব এমন একটি মেয়েছেলে যোগাড় করা গাঁয়ে কিছু শক্ত হবে না।'

'বুড়োর এই প্রস্তাবটা ঢেমনা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। 'কিছু দরকার হবে না রান্নার লোকের, খামকা পয়সা নষ্ট, মোটে তো আমরা

দুজন মানুষ—দুটো ফুটিয়ে নিতে আমিই পারব, নিজের হাতে রেঁধে খেয়ে আমার অভ্যাস আছে।'

'তা তো থাকবেই।' বুড়ো মাথা নেড়েছিল। 'যাকে বলে পোড় খাওয়া মানুষ তুমি, দুঃখ কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছ—এ তো আর নিমু নয় যে আজ পর্যন্ত গায়ে আঁচড়টি লাগল না।' বলতে বলতে বুড়োর চোখের কোণ চিকচিক করে উঠেছিল।

হুঁ, আজও ঢেমনা রান্না করছে। রান্না করছে, কাঠ কাটছে, জল তুলছে, বাসন মাজছে। নিমুর যাতে কোনোরকম অসুবিধে না হয়। তার বাবু—তার মনিব।

রান্না খারাপ হলে বাবু চোখ লাল করছে, মেজাজ খারাপ করছে, ঘরের কাজে ত্রুটি দেখলে চেঁচামেচি করছে। মনিব তো, করবেই। চিরকাল করে।

এসব ঢেমনা গায়ে মাখছে না।

বা যদি কখনো গায়ে লাগে, দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকবে।

কেননা বিশ্বাসের সলতেটা এখনো সে নিভতে দিচ্ছে না। নিভে যাচ্ছে দেখলেই বুড়োর চোখ দুটো তার মনে পড়ে। কৃষ্ণচূড়া ফুল-গাছওয়ালা মস্ত বাড়ির দোতলার বারান্দায় আরাম কেদারায় শুয়ে সুখী মানুষটা বেলেঘাটার ঘোলাটে আকাশ দেখছে। তবে কিনা সেটা বেলেঘাটার আকাশ।

কিন্তু এখানে আকাশ একেবারে নীল, এই আকাশ নিয়ে তিনি

চিন্তা করুন। রোদটা কত তাজা, বাতাস পরিষ্কার। তার ওপর ছেলের জিম্মাদার হয়ে আছে একটি পোড় খাওয়া শক্ত মানুষ।

তাই কোনোরকম ভয় ভাবনা না করে বুড়ো মনিঅর্ডার করে, কখনো লোক মারফৎ টাকা পাঠাচ্ছে।

বিল কেনা হয়ে গেছে। দলিল রেজেস্ট্রারীর কাজ শেষ।

হুঁ, মাছের চাষ আরম্ভ হয়েছে। দু দফায় দু মন বাউস কাতলার পোনা ছাড়া হয়েছে।

মোটর বাইক এসে গেছে। নিমু খুব ব্যস্ত। ছুটোছুটির শেষ নেই। চিঠি পেয়ে বুড়ো নিশ্চিন্ত। সব কাজ সুন্দরভাবে এগোচ্ছে।

কেনই বা এগোবে না। ঢেমনা সঙ্গে আছে যে।

কিন্তু বুড়ো কি জানে, পোড় খাওয়া শক্ত ঢেমনা এই দুমাসে আরও পুড়েছে, পুড়ে আঙরা হয়ে গেছে?

কিন্তু তার এ জ্বালার কথা ঢেমনা জানায় না, জানতে দেয়নি বুড়োকে।

বিশ্বাসের সলতেটা বুড়ো তার হাতে তুলে দিয়েছিল। সেটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে তার কষ্ট হচ্ছে।

ঢেমনা দেখছে, অপেক্ষা করছে। আবার যদি ঢেমনাকে কাজে লাগে।

ছেলেবেলার সাথীকে নিমাইবাবু একদিন ভুলে গিয়েছিল, সার্পেন-টাইন লেনের বাদলার রাতে আবার তাকে মনে পড়েছিল, ঢেমনাকে কাজে লেগেছিল।

তবে কিনা সেদিনের ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটেছিল। কচি পাতা বড় হলে লাল রং মুছে যায়। ক্যানেলের ধারে ছিপ কিনে মাছ ধরতে বসে দুটি শিশুর গলাগলি করে চিনাবাদাম ভাজা খাওয়া, বড় হয়ে কে কবে মনে রাখে। ঢেমনাও কি মনে রেখেছিল?

কিন্তু আজ? আজ ইচ্ছা করে নিমাইবাবু এই দরকারী মানুষটাকে ভুলে গেছে।

হুঁ, তার দরকার আছে, তবে সেটা রান্নার জন্য, জল তোলার জন্য, কাঠ কাটার জন্য, উঠোন ঝাঁট দেবার জন্য। তা না হলে বাড়ির চাকরকে কোন মনিব সারাক্ষণ মনে নিয়ে বসে থাকে।

এমনটা হবে ঢেমনা বুঝেছিল। যেদিন একগাল হেসে লখিন্দর তার ঝিনুকডাঙার বিল বড়বাবুকে বেচে দিয়ে কোঁচড় ভর্তি করে কাগজের নোটগুলি তুলে নিয়ে গেল। কোঁচড় ভরে টাকা নিয়ে গেল, কিন্তু গালের হাসিটা বাবুর পায়ের কাছে রেখে গেল। হাসি দিয়ে বাবুর মন গলিয়ে গেল সে, তার কারণ ছিল, এখন থেকে বিলের সত্ব বাবুর নামে হয়ে গেল কিন্তু বিলের খবরদারী লখিন্দর নিজের হাতে রাখবে. রাখতে চায়, এটা তার অনুরোধ।

জেলের ছেলে। জলের গন্ধ, মাছের গন্ধ ছাড়া যে সে বাঁচতে পারবে না। মরে যাবে।

হুঁ, বিলের খবরদারী। জলে ভিজে রোদে পুড়ে বাবুর পক্ষে সম্ভব না বিল দেখাশোনা করা, তাছাড়া কখন কেমন মাছের চারা ফেলতে হয়, ডিম ছাড়তে হয় বাবুর তা জানা নেই। পয়সা খরচ করে বাইরের জন লাগিয়ে কিছু লাভ নেই, লখিন্দরের লোকজন আছে, তারা রোজ জাল ফেলে চারা মাছ খেলিয়ে খেলিয়ে বড় করে তুলবে। যত বেশি জাল পড়বে জলে, বিলের পোনা তত তাড়াতাড়ি বাড়বে। তার মানে বাবুর পয়সা সকাল সকাল উঠে আসবে। তার ওপর চোর ছেঁচড়ের আনাগোনা রাতদিন লেগেই আছে। কখন কোন ফাঁকে মাছ তুলে নিয়ে যাবে, বাবু টেরও পাবে না। লখিন্দর সব বোঝাল বাবুকে আর হাসল। যদি কেবল লখিন্দর একলা এসে বাবুকে বোঝাত আর গালভরা হাসি উপহার দিত তো বাবু বুঝি দোমনা করত, এমন এককথায় বিলের দখলদারী জেলের হাতে ছেড়ে দিত না।

আর একজন এসেছিল। পাকা চুল কোঁচকানো চামড়া নিয়ে লখিন্দর কথা বলছিল আর তার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা ভরা

মেঘের মতন কালো চুল ও ঝকঝকে নতুন শরীরটা নিয়ে মানুষটা হাসছিল না ঠিক, পাতলা ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে সাদা চিকন দাঁতের ঝিলিক তুলে থেকে থেকে চিকুর হানছিল।

তখনই বিপদ বুঝতে পেরেছিল ঢেমনা। চিতাবাঘিনীর চোখের মতন চকচক করছিল মেয়ের চোখ।

তাই তো, চিরকালের মতন বাবা ঠাকুরদার সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। শহর থেকে এসে বাবু দু'শ বিঘার এতবড় জলা, বলতে গেলে একটা জমিদারী, ক'টা কাগজের নোট ছড়িয়ে দিয়ে কিনে নিচ্ছে, এর উত্তেজনা, এর চমক উনিশ বছরের নতুন হৃৎপিণ্ডে দোলা লাগিয়েছিল, তার বুকের ওঠা-পড়া দেখে ঢেমনা বুঝে গিয়েছিল।

বাবা চুপ করতে মেয়ে বুঝিয়েছিল, 'ঝিনুকডাঙার চার দিকে সাপের গর্ত, ফনিমনসার ঝোপ, আপনার সাধ্য কি সেখানে পা ফেলবেন। কত ঝানু ঝানু জেলেকে সাপে কেটেছে, শেয়ালের কামড় খেয়ে পাগল হয়ে গেছে কতজন--মাছের চাষ করবেন বলে আপনাকে গিয়ে সাপ শেয়ালের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে হবে এমন কি কথা—'

'উহুঁ, বুড়া কর্তার ছেলে আপনি, বুড়া কর্তা এ দেশের রাজা।' লখিন্দর বুঝিয়েছিল। 'আপনার সুখ সুবিধা আমরা দেখব। সখ করে আপনি গাঁয়ে এসে থাকতে চাইছেন—এ আমাদের কত বড় আহ্লাদ।'

মেয়ে বলল, 'মাছের চাষ করতে চাইছেন, টাকা দিয়েছেন যখন আটকাবে না কিছু, কাজ ঠিক চলতে থাকবে, পোনা ছাড়া হবে, মাছ বড় হবে, তারপর জাল দিয়ে ছেঁকে তুলে বাছাই করা মাছ আপনার উঠোনে এনে ফেলা হবে। তারপর সেই মাছ আপনি নিজে খান কি হাটে চালান দেন সে আপনি বুঝবেন।'

'নিজে আর কত খাব।' বাবু হেসে উত্তর করেছিল। 'একলা কত মাছ খাওয়া যায়।'

'তবে আমাদের কিছু বিলিয়ে দেবেন।' ভুরু নাচিয়ে লখিন্দরের যুবতী মেয়ে হেসেছিল। সেই চিকুর হানা হাসি।

ঢেমনা তখনই বুঝেছিল, বাবুর মাছের চাষ হয়ে গেল।

লখিন্দর কোঁচড়ে বেঁধে নোটের কাঁড়ি নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বাবুর জন্য গালভরা হাসি উপহার রেখে গেল। আর হাসির সঙ্গে তার পাখোয়াজ মেয়েকে; যার পেটে পেটে বুদ্ধি, চোখেমুখে দুষ্টামি।

'হুঁ, বাবুর খাওয়া কেমন করে চলছে, রান্নাবান্না করে কে, ঘরদোর অগোছাল হয়ে আছে—সঙ্গে মেয়েছেলে নেই, বাবুর খুবই কষ্ট হচ্ছে। বাবুরা হলেন আমাদের দেশের রাজা, কত বড়মানুষ তেনারা, কত পয়সার মালিক। তুই একটু থেকে সব গোছগাছ করে দিয়ে যা কুন্তি, যাতে বাবুর কোনোরকম অসুবিধা না হয়।'

বাপের আদেশ কুন্তি মাথা পেতে নিয়েছিল।

যেন এই জন্য মেয়ে তৈরী হয়েই এসেছিল। খুশী হয়ে তখনি বাবুর ঘর দুয়ার গোছাতে লেগে গেল। বিছানাপাটি ঝাড়াঝাড়ি আরম্ভ হল। বাক্সপেটরার জায়গায় বাক্সপেটরা গেল, টেবিলটা জানলার ধারে সরে গেল, জামাকাপড় আলনায় উঠল।

'এগুলো? এ সব কার?' কিছু ময়লা মতন জামা কাপড় বেছে আলাদা করে ফেলল লখিন্দরের মেয়ে। পাকা চোখ। এক নজর দেখেই বুঝল, রাজার ছেলের গায়ে এসব জিনিস ওঠে না।

'এগুলো ঢেমনার।' বাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল।

'ঢেমনা?' চমকে উঠেছিল কুন্তি। চোখ আড় করে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াল, কালো লম্বা চেহারার মানুষটাকে এই প্রায় ভাল করে দেখল। তখন উঠোনে বাপের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কেবল বাবুকেই দেখছিল, বাবুর সঙ্গে কথা বলছিল। আর একটা জোয়ান পুরুষের দিকে চোখ ফেরাবার সময় ছিল না। 'আপনার চাকর?'

ঢেমনাকে দেখা শেষ করে বাবুর দিকে চোখ ফিরিয়েছিল কুন্তি।

বাবু মাথা নেড়েছিল। এবং হেসে বলেছিল, 'আমার বন্ধু।'

'বন্ধু!' যেন আর একবার চমকে উঠেছিল লখিন্দরের মেয়ে। আর একবার ঢেমনাকে দেখেছিল। ফিক্ করে হেসে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তা চাকর যদি বন্ধুর মতন কাজ করে, চাকরও বন্ধু হয়, ভাইয়ের মতন কাজ করলে চাকরকে ভাই বলতেও বাধা থাকে না।'

'তা অবশ্য থাকে না।' বাবু বিড় বিড় করে উত্তর করেছিল। শুনে ঢেমনা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিল।

অর্থাৎ হাওয়া তখন থেকেই ঘুরতে আরম্ভ করেছিল।

ঢেমনার জামা কাপড় আলাদা হয়ে গেল, বিছানা আলাদা হয়ে গেল। বাবুর সঙ্গে চাকরের একত্র থাকা, এক সঙ্গে ওঠা-বসা ভাল লাগল না ছুঁড়ির। ঢেমনার থাকার জন্য আলাদা ঘর ঠিক হল। ছোট ঘরে তার জিনিসপত্র চলে গেল।

কিন্তু প্রথম দু' চার দিন তার ছোট ঘরেও গেছে লখিন্দরের মেয়ে। ফ্যাল ফ্যাল করে ঢেমনাকে দেখত। তা তো দেখবেই, ঢেমনা ভাবত, চাকর হোক আর যাই হোক, একটা জোয়ান মরদ সে। বাবুর যদি মাজাঘষা পালিশ ফরসা টুকটুকে চেহারা হয়, ঢেমনার কাঠখোট্টা শক্ত মজবুত কালো শরীরটারও তো একটা রূপ আছে, আর সেই রূপ যদি যুবতী মেয়ের মনে নেশা ধরিয়ে দেয় তো সেটা খুব দোষের হয় কি।

তাই ঢেমনার ভালই লাগত মেয়েটাকে দেখলে।

'তোর এই বিদ্ঘুটে নাম রাখল কে?'—হি-হি করে হাসত ছুঁড়ি।

'মা।' ঢেমনা গম্ভীর হয়ে উত্তর করত।

'ওই নাম বাদ দিয়ে দে।' সেদিন টুক করে ঢেমনার ময়লা বিছানার ওপর বসে পড়েছিল লখিন্দরের মেয়ে। ঢেমনা খুশী হয়েছিল। যেন তার চোখেও একটু নেশা লেগেছিল। এমন পাতলা

ছিপছিপে গড়ন, এমন সারাক্ষণ ঝিলিক দেওয়া কালো চোখের হাসি, বাঁশ পাতার মতন পাতলা দুটো ঠোঁট।

হুঁ, চুরি করে ঢেমনা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

কিন্তু এ দু'চার দিন।

'না, মা বাপের দেওয়া নাম বাদ দেওয়া যায় না।' ঢেমনা বলেছিল, 'তবে তো এই গায়ের ময়লা রংটাও ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলতে হয়।'

চোখ কপালে তুলেছিল মেয়ে।

'ছুরি দিয়ে চেঁছে গায়ের রং তোলা যায় নাকি?'

'ওই আর কি।' ঢেমনা মিটিমিটি হাসছিল। 'মানে রং তুলতে গিয়ে চামড়াটা চেঁছে তুলতে হবে।'

'তবে যে তুই মরে যাবি।'

'কাজেই আমার নামটাও বাদ দেওয়া চলবে না। তা হলে আমি মরে যাব।'

একটু গম্ভীর থেকে কুন্তি বলেছিল, 'তা তো বটেই। থাক্ তবে তোর ওই নাম।' বলে তখনই আবার হি-হি করে হাসতে আরম্ভ করেছিল।

'ঢেমনা, ঢেমনা!'

ঢেমনার মনে হচ্ছিল, ওই নামটা বার বার আউড়ে ছুঁড়ির ভালই লাগছিল। হুঁ, ঢেমনার চোখে একটু যেন নেশা ধরতে শুরু করেছিল। তার এত কাছে কোনো মেয়ে আর আসেনি, কোনদিন কোনো যুবতী তার বিছানায় বসেনি। কোনোদিন এতক্ষণ কারো সঙ্গে সে কথা বলেনি। আর সময়ই বা সে পেল কোথায়। সারাজীবন যেমন হাঁটা আর হাঁটা, ঘোরা আর ঘোরা। কখনও ধূপকাঠির প্যাকেট বগলে, কখনও শায়া ব্লাউজের বোঁচকা মাথায়, তারপর এল তিনচাকার রুটির গাড়ি, রৌদ্রে ঘোরা বৃষ্টিতে ঘোরা। চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছে কি? দু' দণ্ড কারো সঙ্গে কথা বলেছে?

হুঁ, তবে কি মেয়েছেলে দেখেনি? ঢের দেখেছে এই জীবনে। তার কাছ থেকে ধূপকাঠি রেখেছে, শায়া ব্লাউজ কিনেছে, না কিনলেও দর কষাকষি করেছে, কিন্তু সে তো জানালায় দাঁড়িয়ে, রকে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে জিনিস দেওয়া, হাত বাড়িয়ে জিনিস নেওয়া। কেউ এভাবে বিছানায় বসেনি। কেউ তার নাম নিয়ে এমন রগড় করেনি, হি হি করে হাসেনি।

'তোর বাপ মার রং খুব ময়লা ছিল?'

'হুঁ।' ঢেমনা উত্তর করেছিল। 'কাজেই রংটাও বাদ দেওয়া যাবে না।'

যেন তারপর হঠাৎ কী ভাবতে ভাবতে যুবতী তার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। চোখে মুখে দুষ্টামির হাসিটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল।

'কোনো মেয়ে তোকে ভাল বেসেছিল?'

'হুঁ,' ঢেমনা মাথা নেড়েছিল।

'তুই? তুইও ভালবেসে ছিলি?'

'তা বেসেছিলাম বৈ কি।' ঢেমনা এখন চিন্তা করে, কেন জানি নে হুট করে সেদিন একটা মিছে কথা বলে ফেলেছিল।

কালো চোখ দুটো গোল হয়ে উঠেছিল লখিন্দরের মেয়ের। একটা ঢোক গিলেছিল। যেন সরস গল্প শুনবে বলে তার জিভে জল এসেছিল।

তখুনি আবার ধপ করে তার বিছানায় বসে পড়েছিল।

'শুনি শুনি? কেমন ছিল মেয়েটা দেখতে?'

'ঠিক এমন।' ঢেমনা হাতের আঙুলটা কুন্তির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

'ইস, আমার মতন। আমার মতন এমন ফরসা রং, এমন সরু কোমর, এমন মেঘের মতন কুচকুচে চুল মাথায়, তুই পেয়েছিলি কোথায় শুনি?'

'ঢের মেয়ে ছড়িয়ে আছে কলকাতা শহরে।' এর চেয়েও অনেক সুন্দরী মেয়ে, ডানাকাটা সব পরী রাস্তা ঘাটে, অলিতে গলিতে, রকে বারান্দায় ছাদে সিঁড়িতে চোখে পড়ে।'

শুনে মুখটা কালো করে ফেলেছিল যুবতী। ঢেমনার ভাল লেগেছিল থমথমে মুখটা দেখতে। কালো চোখ দুটো যেন একটু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

'হুঁ, তারপর কী হল সেই মেয়ের ? কোথায় তোর সঙ্গে দেখা হত ?'

'জানালায় এসে দাঁড়াত। ধূপকাঠির প্যাকেট নিয়ে আমি ওদের জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়াতাম।'

'তারপর ?'

'দর জিজ্ঞেস করত, ধূপকাঠির প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখত।'

'রাখত না নিশ্চয়ই ? রোজ কি আর কেউ ধূপকাঠি রাখে ?' লখিন্দরের মেয়ের চোখে আবার হাসির ঝিলিক লেগেছিল।

ঢেমনা হেসেছিল।

'না, তা রাখত না।'

'মানে একটু চোখের দেখা, একটু কথা বলা ?'

'হুঁ, তাছাড়া রোজ ওই জানালার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াব কেন, আর ওই বা গরাদে কপাল ঠেকিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে কেন।'

'তারপর ? বাড়িতে ঢুকতে তোর সাহস হত না, আর ওই মেয়েও ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না, তাই না ?'

'হুঁ।'

'আহা বড় কষ্টের ভালবাসা।'

কুন্তি বড় করে নিশ্বাস ফেলেছিল। 'বাড়ির মানুষ বেশি কড়াকড়ি করলে ভালবাসার মেলাই অসুবিধা।'

'এদিক থেকে তোমার খুব সুবিধে।'

প্রথম দুচার দিন লখিন্দরের মেয়েকে তুমি করেই যেন বলেছিল ঢেমনা, 'যখন খুশী বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছ, বাবা কিছু বলছে না।'

'কী বলবে, কেন বলবে!' ফোঁস করে উঠেছিল কুন্তি। 'ধমক দিয়ে বুড়োকে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা করে দেব না! ইস, আমাকে আবার কিছু বলবে, সাহস কত।'

'পাখোয়াজ মেয়ে।' ঢেমনা তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে বাঁচে না। 'তুমি তো হুটহাট বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছ। বাপ কি একদিনও কিছু বলছে না?'

'কেন বলবে শুনি?' কুন্তি এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিল। 'আমি কি বে-লাইনে হাঁটাচলা করি যে বুড়ো কথায় কথায় আমায় শাসন করতে আসবে? এই তো তুই একটা জোয়ান ছেলে, একলা ঘরে তোর বিছানায় বসে আছি, কিন্তু একবার আমার গায়ে হাত দে দিকিনি?'

'দেব?' হাসতে হাসতে ঢেমনা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

'থাপ্পড় মেরে গালের মাংসটা উড়িয়ে দেব না? ঘুষি মেরে নাকটা থেঁতো করে দেব যে।' কুন্তি সত্যি হাতের মুঠো পাকিয়ে তুলেছিল। ঢেমনা তখনি হাত গুটিয়ে নিয়েছিল।

'ব্বাস, তেজ আছে বটে মেয়ের।'

'তেজ আছে বলেই বাবা কিছু বলে না।'

'এটা ভাল, তেজ থাকা ভাল। মেয়েছেলের তেজ না থাকলে রাতারাতি টকে যায়, দুর্গন্ধ বেরয়।'

'ইস্ কথার কী ছিরি দেখ, শহুরে ছেলে, তায় কিনা আবার ফেরিওয়ালা, মুখটা খুব আছে—' কুন্তি এবার ঝলক দিয়ে উঠেছিল। 'এখন বল্ তোর সেই মেয়ের কী হল—'

'ঐ যে বললাম, বাড়ি থেকে বেরতে দেয় না, ছটফট করছিল, আমারও ইচ্ছে করত, কাছে বসিয়ে গল্প করি—কী করা যায় ভেবে

ভেবে শেষটায় একদিন একটা বুদ্ধি মাথায় এল। আগের দিন ওকে বলে গেলাম, আমি কাল দুপুরে রাস্তার উল্টোদিকে লাল রঙের চিঠির বাক্সটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকব, ও চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে। তখন ওর মা ঘুমোয়, দিদি ঘুমোয়, বাপ আপিসে চলে যায়, রাস্তাটাও ফাঁকা থাকে—ও বেরিয়ে এলে দুজনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকব। দুজন একসঙ্গে বসে চা খাব, গল্প করব—'

'তারপর?' লখিন্দরের মেয়ে চোখের পলক ফেলছিল না। ভালবাসার গল্পটা তার খুব মনে ধরেছে, ঢেমনা বুঝতে পারছিল। একটা মিছে গল্প বলে গাঁয়ের ছুঁড়িকে খুব তাক লাগিয়ে দিতে পেরেছে দেখে ঢেমনা সেদিন বেশ মজা পাচ্ছিল।

'মেয়েটা বুঝি শেষ পর্যন্ত আর বেরতে পারল না? সেজে গুজে বাড়ি থেকে বেরবে আর অমনি মার ঘুম ভেঙে গেল, নাকি দিদির?' প্রশ্ন করে চেয়ে রইল কুন্তি।

ঢেমনা মাথা নেড়েছিল। লম্বা লম্বা দুটো নিশ্বাস ফেলেছিল।

'বেরিয়েছিল ঠিকই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই চওড়া রাস্তার অর্ধেকটা পার হয়ে এসেছিল।'

'তারপর? তখন বুঝি পেছন থেকে জানালা দিয়ে দিদি দেখে ফেলল, নাকি মা?'

'কেউ না, কেউ দেখেনি, সব তখন নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। অর্ধেক রাস্তা পার হয়েছে, আর ঠিক তখন পেছন থেকে একটা লরী এসে ধাক্কা দিল।'

'অ্যাঁ!' চমকে উঠেছিল কুন্তি। যেন হঠাৎ ভয়ে আঁতকে উঠে খপ করে ঢেমনার একটা হাত চেপে ধরেছিল। যেন শ্বাস পড়ছিল না। তারপর একটু পরে হাতটা সরিয়ে নিয়েছিল লখিন্দরের মেয়ে, ধরা গলায় বলেছিল, 'তুই কি করলি, তখন হাসপাতালে নিয়ে গেলি ওকে?'

'কাকে আর হাসপাতালে নিয়ে যাব', বিষণ্ণ গলায় ঢেমনা

বলেছিল, 'দুটো চাকা চলে গেছে বুকের ওপর দিয়ে—একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, ওখানেই প্রাণটা শেষ—'

তারপর আর অনেকক্ষণ কথা বলেনি কুন্তি। তারপর যখন কথা বলছিল তার দুষ্টামি ভরা কালো চোখ দুটোও ছলছল করছিল। 'আহা। তোর কপালটা বড় মন্দ। একটা মেয়ে ভালবেসেছিল, সেও রইল না, লরী চাপা পড়ে মরে গেল।'

'সে আর বলতে।' চেমনা মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে থুথু ফেলেছিল।

তারপর বাবুর ডাক শুনে লখিন্দরের মেয়ে বাবুর ঘরে চলে গেছে। যাই হোক, প্রথম দু-একদিন চেমনার ছোট ঘরেও এসেছিল ছুঁড়ি। এসে ভালবাসার গল্প শুনত। অবাক হয়ে চেমনাকে দেখত। হুঁ, মাথায় তেল পড়ে না, গায়ে ময়লা জামা আছে, তার জামা কাপড় ছেঁড়া, ময়লা বিছানা, তা হলেও তো পুরুষ, একটা জোয়ান ছেলে। বাবুর যদি একরকম রূপ, জোয়ান চাকরের আর এক রূপ। যেন তাই দেখতে কুন্তি ছুটে ছুটে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাবু বাইক নিয়ে চলে গেছে, নেবুতলার ঠাণ্ডা ছায়ায় চেমনার পাশে বসে ছুঁড়ি গল্প করেছে। অর্থাৎ মনটা তখনও সরল ছিল। ভিতরে তেজ ছিল, পাখোয়াজ মেয়ে, প্রথম থেকেই চোখেমুখে দুষ্টামি। তা হলেও প্যাঁচ ছিল না, বাবুর খাওয়ার দিকে নজর রাখত, চেমনা কী খাচ্ছে না খাচ্ছে দুবার উঁকি দিয়ে দেখে গেছে।

ঐ দু-চারদিন।

তারপর বাতাস ঘুরে গেল।

আরম্ভ হল চেমনাকে দেখে ঠোঁট মোচড়ানো হাসি, নাক কোঁচকানো। যেন একটা ঘেন্নার ভাব, দৃষ্টির মধ্যে তাচ্ছিল্য।

আর সারাক্ষণ বাবুর ঘরে।

বাবুর মাছের চাষ লখিন্দর নিজে দেখছে, বাবুর চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে কেনা দু'শো বিঘার বিল লখিন্দরের লোকজন দিনরাত

পাহারা দিচ্ছে। বাবু খায়দায়, বিশ্রাম করে বেড়ায়, কিছু কেনাকাটার দরকার হলে মোটর বাইক ছুটিয়ে শহরে চলে যায়। শহর থেকে ফিরে এসে উঠোনে পা দিয়ে, দরাজ গলায় ডাকে, 'কুস্তি কুস্তি', —কুস্তি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। বাবুকে দেখে হি-হি করে হাসে—চব্বিশঘণ্টা কুস্তি এখন এবাড়ি।

অর্থাৎ ঢেমনা বুঝতে পারল, বিলের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ছুঁড়ির চোখের দুষ্টামিটা আর শুধু চোখের মধ্যে লেগে নেই, চোখ থেকে মনে নেমে এসেছে। ঢেমনার বুকের ভিতর হু হু করে উঠল।

তারপর দু' মাসে সে অনেক দেখেছে, অনেক কিছু সয়েও গেছে।

বেশি বাড়াবাড়ি দেখলে এখন চোখ বুজে থাকে। কিন্তু ঐ যে, বজ্জাত মেয়ে যখন ন্যাকামো করতে আসে, নতুন শাড়ি জামা দেখাতে, খোঁপার ফুল দেখাতে, পায়ের চটি দেখাতে সামনে এসে দাঁড়ায়, মিষ্টি গলায় 'ঢেমনা ঢেমনা' ডাকে, তখন আর সে সহ্য করতে পারে না, তার মাথায় খুন চেপে যায়, উননের চেলা কাঠ তুলে মুখটা পুড়িয়ে দিতে পারলে তবে যেন আক্রোশ মেটে। রাগ কমে।

'এই ঢেমনা!'

ঢেমনা মুখ তুলছিল না। রুই মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছিল। এতবড় মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে লখিন্দর। একটা মানুষ বয়ে আনতে পারে না।

বাবু মাছ দেখে মহা খুশী।

কালিয়া হবে পেটি দিয়ে। পিঠের টুকরোগুলো কড়া করে ভাজতে হবে। বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে কুস্তিও মাছ দেখছিল তখন। ঢেমনাকে

রান্নার নির্দেশ দিচ্ছিল দু'জনে মিলে। 'আর মুড়োটা দিয়ে হবে ঘণ্ট।'

'হুঁ, মুড়িঘণ্ট। চমৎকার হবে।' বাবু কুন্তির কথায় সায় দিয়েছিল। সব বলা-টলা শেষ করে দু'জনে সরে গেছে। এখন তার চোখের সামনেই কুন্তির হাত ধরে হাঁটে বাবু। হাত ধরাধরি করে দু'জনে ওদিকের বাগানে বেড়াতে গেছে।

কিন্তু আবার ছুঁড়ি এসেছে কেন! একলা এসেছে।

ঢেমনা মুখ তুলছিল না। কথা বলছিল না।

'এই ঢেমনা, এদিকে তাকা না।'

'বললেই হয় কী বলার আছে, কাজ করছি চোখে দেখছিস না?'

'আহা! কাজ তো তোকে করতেই হবে। মাইনে নিচ্ছিস, খোরাক পাচ্ছিস। বসে থাকতে তোকে আনা হয়নি।'

'এখান থেকে তুই সরে যা, আমার হাতে এটা কী দেখছিস তো।'

'তোর হাতে বঁটি।' মাছ কাটার এই প্রকাণ্ড বঁটিও লখিন্দর কামার বাড়ি থেকে গড়িয়ে বাবুকে এনে উপহার দিয়েছে। কলকাতা থেকে যে বঁটি আনা হয়েছিল তা দিয়ে লাউ কুমড়ো বেগুন পটল কোটা যায়, ঝিনুকডাঙা বিলের এতবড় কাতলা মাছ কাটা যায় না। এ সব পুরনো মাছ। কোন্‌টার কত বয়স হয়েছে লখিন্দর এখন নিজেই ভুলে গেছে। হুঁ, রুই কাতলা শোল বোয়াল। স্যাওলা ধরে গেছে কোনোটার গায়ে। কাজেই যেমন মাছ তেমন তার পেট কাটার জন্য, গলা কাটার বড় বড় অস্ত্র চাই। বঁট দেখে বাবু খুশী হয়েছিল। 'এ দিয়ে যে মানুষ কুচিয়ে কাটা যাবে, লখিন্দর।'

'মানুষ!' লখিন্দর বুঝি বাবুর কথা শুনে অবাক হয়েছিল। সাদা ভুরু দুটো কুঁচকে বাবুর কচিপনা মুখটা দেখেছিল। তারপর গাল ছড়িয়ে হেসেছিল। 'মানুষ কাটতে আপনার ঐ পটল ঝিঙের বঁটি আছে, আমার এই বঁটি দিয়ে হাতি কুচিয়ে কাটুন না বাবু, মোষ কুচিয়ে কাটুন, কেমন কচ কচ করে নেমে যায় দেখবেন। আটকাবে না কোথাও।'

লখিন্দরের কথা শুনে বাবু খুব হেসেছিল।

সেই বঁটি হাতে তুলে ঢেমনা কুন্তিকে দেখাল। কিন্তু কুন্তি ভয় পেল না। চেঁচাল না। বাবু বাগানে আছে। ঢেমনা ইচ্ছা করলেই এখন কিছু করতে পারবে না, তার খুব জানা ছিল। তাই বঁটি দেখে সে খিলখিল করে হাসল।

'আমায় কাটবি নাকি ?'

'তুই এখান থেকে সরে যা, আমায় কাজ করতে দে।'

'তোর কাজ দেখতেই বাবু আমায় পাঠাল। মাছ কাটা খারাপ হলে বাবু ভীষণ রাগ করবে। খণ্ডগুলো বড় বড় হবে। পিত্তটা টেনে ছিঁড়তে গেলে গলে মাছ তেতো হয়ে যাবে। মুখে দেওয়া যাবে না।'

ঢেমনা চুপ করে থেকে মাছের পেট চিরছিল। মাছের গন্ধে মাথার ওপর রাজ্যের কাক এসে জুটেছে। কা-কা শব্দে বাড়ি মাথায় তুলেছে। রান্নাঘরের পিছনে চালতা গাছের নিচে হোগলার চাটাই বিছিয়ে ঢেমনা মাছ কুটছিল।

'বুঝলি, পিত্ত গলিয়ে ফেললে সেই মাছ বাবু আর মুখে তুলতে পারবে না।' এবার গলা বাড়িয়ে ঢেমনার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ছুঁড়ি কথা বলতে লাগল। ঢেমনা হাতের বঁটি রেখে দিল। কী করবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। তার মাথার ভিতর আগুন জ্বলছিল।

হাতের কাজ বন্ধ রেখে হঠাৎ এমন গুম হয়ে ঢেমনা বসে রইল দেখে কুন্তি যেন আরো মজা পেল।

'আচ্ছা, আমি কথা বলতে এলে তুই এত চটিস কেন ?'

ঢেমনা চোখ তুলল। 'তোকে বলেছি, আমি যখন কাজ করি, আমার সঙ্গে কথা বলবি না। আমার সামনে একদম আসবি না।'

'আহা! আমি না এলে এটা ওটা তোকে করতে বলে দেবে কে, বাবু এসে বলবে ? তোর যা বুদ্ধি, হয়তো পেটির মাছ ভাজতে শুরু করবি, পিঠের মাছ ঝোলে দিবি।'

'বেশ তো বাগানে বসে গল্প করছিলি বাবুর সঙ্গে, এখানে আবার মরতে এলি কেন ?'

'ও, আসল রাগ তোর এখানে, বাবুর সঙ্গে কথা বলি আর তাই দেখে হিংসেয় তোর পেট জ্বলে যায়।' হাতের আঙুল দিয়ে কুন্তি চিবুক ঠোঁট চেপে ধরে নতুন করে হাসতে আরম্ভ করল, যেন হাসি লুকোতে মুখে এভাবে আঙুল চাপা দিল। কাজেই লম্বা ফর্সা আঙুলে একটা নতুন জিনিস ঢেমনার চোখে পড়ল। পাথর বসানো এত বড় একটা আংটি রোদের টুকরো নেমে ঝকমক করছে।

'কি দেখছিস অমন করে ?'

'কিছু না।' ঢেমনা তখনি মুখ নামিয়ে বঁটিটা তুলে নিল। ঘাড় গুঁজে লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কুন্তিও আর দাঁড়ায় না, যে জিনিস দেখাবার জন্য এসেছিল, তা দেখানো হয়ে গেছে, এবার ছোঁড়া নতুন ঘরে পুড়তে থাকুক।

'বুঝলি, যেমন বলে গেলাম সে ভাবে সব করবি, গোলমাল হলে বাবু তোর পিঠের ছাল তুলবে।' বলতে বলতে লখিন্দরের মেয়ে বাগানের দিকে চলে গেল।

ঢেমনা চুপ করে রইল। অর্থাৎ এসব কথা শোনাও তার অভ্যাস হয়ে গেছে। যেমন ছ'মাসে অনেক কিছু দেখে চোখ দুটোর অভ্যাস হয়ে গেছে।

আজ আর সে দাঁত খিঁচোল না, হৈ হৈ করল না, হাতের বঁটি তুলে ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, মেয়েটাকে তাড়া করল না।

উঁহু, রাগ না হিংসা না, জ্বলুনি পুড়নি—কিছুই না, কী আর জ্বলবে, কি পুড়বে, পুড়ে পুড়ে কাঠ ছাই হয়ে গেলে আর আগুন থাকে ? কাজেই সব আগুন, সব পোড়া শেষ করে দিয়ে এখন সে ছাইয়ের পিণ্ড হয়ে এখানে পড়ে আছে।

উঁহু, জেদ অভিমান কিছুই আর ভেতরে নেই তার। কদিন ছিল। এক একবার তার ইচ্ছা হয়েছে কলকাতায় ফিরে যায়,

গিয়ে কৃষ্ণচূড়া ফুলগাছওয়ালা বাড়ির দোতলার বারান্দায় উঠে বুড়ো কর্তাকে তার বিশ্বাসের সলতেটা ফিরিয়ে দেয়, দিয়ে বলে, 'আমাকে দিয়ে হল না, আপনি আর কাউকে দেশে পাঠান, আর কেউ গিয়ে আপনার খোকার ভালমন্দ দেখুক—আমি হেরে গেছি, পালিয়ে এসেছি।'

'খোকা কী করছে সেখানে?' ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে কর্তা প্রশ্ন করত।

'মাছের চাষ করছে।' কর্তার শুকনো সাদা পা দুটোর দিকে চোখ রেখে সে বলত, 'দু মণ চারা পোনা বিলের জলে ছাড়া হয়েছে।'

'তো তুই চলে এলি কেন!' কর্তা ব্যাকুল হয়ে উঠত। 'সাংসারিক বোধবুদ্ধি নেই ছোঁড়ার, নিমুকে একলা রেখে এলি, তাকে দেখবে কে এখন?'

ঢেমনা চুপ করে থাকত। তাই তো, এই প্রশ্নের কী উত্তর দিত সে। লখিন্দর দেখছে, লখিন্দরের মেয়ে দেখছে আপনার খোকাকে, বলতে পারত কি? পারত না। আমার ভাল লাগে না, জলে ডাঙ্গায় কাদা মাটির দেশে মন টেঁকে না। তার চেয়ে কলকাতার বাঁধানো রাস্তায় ঘুরে ঘুরে রুটির গাড়ি চালাব, তাই ফিরে এসেছি—বলতে পারত কি সে? পারত না, চুপ করে থাকত।

বুড়োর ঐ ব্যাকুল চোখ, কাতর চেহারাটা দেখতে হবে—ভয় পেয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার ইচ্ছাটা ঢেমনাকে শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হয়েছে।

অভিমানে? কার ওপর অভিমান করবে? অভিমান তখনই খাটে যখন কেউ মুখ ফিরিয়ে তাকায়। নিমুর সময় নেই ঢেমনার দিকে তাকাবার।

ঢেমনা কাঠ কাটছে, জল তুলছে, বাটনা বাটছে, রান্না নামাচ্ছে। তার কর্তব্য করে যাচ্ছে সে। চিরকাল কষ্ট করেছে। এখানেও

কষ্ট করতে এসেছে। তাই তো বুড়োকে বলে এসেছে ঢেমনা, 'আমার হাতে সব ছেড়ে দিন, আমি খোকার সুখস্বুবিধা দেখব, আঁচড়টি তার গায়ে লাগতে দেব না।'

তাই ভেবে, নিমুর এতটুকু অসুবিধা না হয় চিন্তা করে, ঢেমনা যদি সারাদিন রান্না আর জল তোলা, বাসন মাজা আর কাপড় কাচা নিয়ে মুখ বুজে খাটতে থাকে তো এই নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু আছে নাকি। নিমাই মাথা ঘামায় না।

তাই দেখছে ঢেমনা। বাবু তার দিকে তাকায়ও না।

কিন্তু কোনোদিন কি তাকাবে না? সার্পেনটাইন লেনের সেই বাদলার রাত কি আর একবার ফিরে আসবে না?

ঢেমনা সেই অপেক্ষায় আছে।

ওপরটা ছাই হয়ে গেছে ঠিকই। জেদের আগুন নিভে গেছে, অভিমানের উত্তাপ জুড়িয়ে গেছে।

কিন্তু ছাইয়ের নিচের আগুন এখনো ধিকধিক্ করছে। যেন এইজন্য কলকাতায় ফিরে যাওয়া হবে না। একটা কারণ। সে দেখবে। যে খেলা আরম্ভ হয়েছে তার শেষ দেখবে।

তাই চাকরের চেয়েও বেশি চাকর বনে গিয়ে সে চুপ করে আছে।

আশ্বিনের সকাল। বাবুর বাগানে শিউলি ফুটেছে। ঝলক দিয়ে দিয়ে ওদিক থেকে হাওয়া শিউলির গন্ধ ভাসিয়ে নিয়ে আসছে।

একটা খিলখিল হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছিল। বাগানে বসবার জন্য, পাশাপাশি দু'জন বসা যায় এমন ক'টা কাঠের চেয়ার পাতা হয়েছে। বাবু ছুতোর ডাকিয়ে তৈরি করেছেন। কর্তার আমলে চেয়ার ছিল না। গিন্নিকে নিয়ে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কর্তা বুঝি ঘাসের ওপর বসে পড়তেন। হুঁ, ওখানে ভুর ভুর শিউলির গন্ধ, খিলখিল হাসি। ঢেমনার চারপাশে মাছি ভন ভন করছিল, মাথার ওপর কাকের দল নতুন করে কা কা করে উঠল। মাছের

পেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ঢেমনা নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করল। পিত্তটা সাবধানে ছিঁড়ে টেনে বের করল। মাছের গায়ে লাগল না। কিন্তু নখের আঁচড় লেগে থলেটা হাতের মধ্যে ফেটে গিয়ে তার হাতের তেলো আঙুল নখ আরও নীল হয়ে গেল।

কলকাতার বরফপচা মাছের কালচে পিত্ত দেখেছে সে। এত গাঢ় সবুজ নীল রং কোনোদিন দেখেনি। হাতটা চোখের সামনে তুলে ঢেমনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

'এই যে দাদা, নমস্কার।'

ঢেমনা থমকে দাঁড়াল। চাকরকে দেখে নমস্কার! অবাক হয়ে মানুষটার মুখ দেখে ঢেমনা।

'চিনতে পারলেন না।' সাদা দাঁত ছড়িয়ে মানুষটা হাসছে।

'না, চিনতে পারলাম না।' ঢেমনা ভুরু কোঁচকাল।

'আমার নাম মদন। মদন কৈবর্ত।'

ঢেমনার হাতে তেলের টিন। হাটে চলেছে। আজ গাঁয়ের হাট। সরষের তেল আনতে হবে। মশলাপত্তরও ফুরিয়েছে। মশলাপাতি আনতে হবে। কিন্তু রাস্তার মাঝপথে এই নমস্কারের ঘটা কেন!

'কে তুমি?' ঢেমনা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল।

'ঐ যে বললাম, আমার নাম মদন। মদন কৈবর্ত। আমি লখিন্দর দাসের লোক।'

'অ।' এবার ঢেমনা চিনল, অর্থাৎ চিনতে পেরেছে এমন ভঙ্গি করে মাথাটা কাৎ করল।

তাছাড়া জোয়ান ছেলে মদন। গোঁফের রেখা সবে দেখা দিয়েছে। চোখ দুটো ঝকঝক করছে। বুকটা চেতিয়ে উঠেছে। কাঁধে মাংসের গোছ উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে।

'আমি আপনাকে ঐ ছাতিম গাছটার নিচে থাকতেই দেখে চিনে ফেলেছি।' আঙুল দিয়ে মদন দূরের একটা গাছ দেখাল। 'বাবুর বাড়ির লোক হাটে চলেছে।'

'আমি বাবুর চাকর।' ঢেমনা ঘাড় বেঁকিয়ে থুথু ফেলল।

'এই জন্যই দাঁড়িয়ে পড়লাম, ভাবলাম দাদাকে একটা কথা বলব।' মদন আর একবার দাঁত ছড়িয়ে হাসল। ভুরু কুঁচকে রেখে হাঁটতে লাগল। মদন সঙ্গে সঙ্গে চলল।

'এই নিন দাদা বিড়ি খান।'

মদন ট্যাঁক থেকে বিড়ির বাণ্ডিল ও দেশলাই বার করে ঢেমনার হাতে তুলে দিল।

'হুঁ, কী কথা?' বিড়ি ধরিয়ে ঢেমনা চোখ আড় করে মদনের মুখটা দেখল।

'আসুন না, এই গাছতলাটায় বসি, হাটের দেরি আছে। এখনো তেমন ভাল করে জমেনি।'

'উঁহু, দেরি হয়ে গেলে মুশকিল হবে। মুর্গি ছুলে রেখে এসেছি, ফিরে গিয়ে মাংস পাক করতে হবে। টাইম মতন রান্না নামিয়ে না দিতে পারলে বাবু আমার পিঠের ছাল তুলে ফেলবে।'

'বাবু খুব কড়া?'

'হুঁ।' তাহলেও অশ্বত্থ গাছের ঠাণ্ডা ছায়াটা দেখে ঢেমনা দাঁড়িয়ে পড়ার লোভ সামলাতে পারল না। তাছাড়া হেঁটে হেঁটে বিড়ি টেনে তেমন সুখ পাচ্ছিল না।

'বসো দাদা, বসো।'

মদনের দেখাদেখি ঢেমনা একটা মোটা শিকড়ের ওপর বসল। তেলের টিনটা নামিয়ে পাশে রাখল। অশ্বত্থ পাতার ঝুপরির ভিতর

ছোট ছোট অগুন্তি পাখি এসে জুটেছে। কিচির মিচির শব্দে কান পাতা যাচ্ছিল না।

ঢেমনা চোখ তুলে পাখি দেখছিল।

মদন ঢেমনার মুখ দেখছিল।

'তবে কিনা', ঢেমনা চোখ নামিয়ে বলল, 'বাবুর চেয়েও বাবুনি বেশি কড়া।'

মদনের চোখ ছুটো গোল হয়ে গেল, শব্দটা তার কাছে নতুন ঠেকল, হাঁ করে ঢেমনার দিকে চেয়ে রইল। ঢেমনা জোরে জোরে বিড়ি টানতে লাগল।

'বাবু তো বৌ আনেনি, এখনো শাদি হয়নি শুনেছিলাম যেন?' মদন বিড় বিড় করে উঠল।

ঢেমনা গলার ভিতর কেমন একটা শব্দ করে হাসল। 'দেশলাইটা দেখি?'

মদন হাত বাড়িয়ে দেশলাই দিল। ঢেমনা পোড়া বিড়িটা ধরিয়ে নিল। তারপর মদনের চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

'শাদি না করলেও বাবুনি থাকতে দোষ কি, বাবুদের এমন একটা ছুটো থাকে।'

কেমন যেন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়ে মদন ছটফট করতে লাগল। ঢেমনার মুখের দিক থেকে চোখ ছুটো সরাতে পারছিল না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে, পরে আস্তে নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু বাবুর বাড়িতে সেদিন তো কোনো মেয়েছেলে দেখলাম না?'

'চোখ না থাকলে কেমন করে দেখবে ভাই,' ঢেমনা থুতনি তুলে গাছের পাতা দেখতে দেখতে বলল, 'তোমার যদি চোখ খোলা থাকত ঠিকই দেখতে পেতে।'

'লখিন্দর কাকার মেয়ে কুন্তি ছাড়া আর কোনো মেয়েছেলে আমার চোখে পড়ল না।' মদন বলল।

'ঐ, ঐ তো দেখে এয়েছ, হুঁ ঠিকই দেখেছ।' ঢেমনা জোরে মাথা ঝাঁকাল।

মদন হঠাৎ গুম হয়ে গেল। ঢেমনার দিকে আর চোখ ছিল না। মাটির দিকে চোখ রেখে কী যেন খুব ভাবতে লাগল। বিড়ির বাণ্ডিলটা সে খুলে রেখেছিল।

ঢেমনা হাত বাড়িয়ে আর একটা বিড়ি তুলে নিয়ে ধরাল।

'বাবু আমার কড়া না', এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঢেমনা বলল, 'তোমাদের ঐ লখিন্দরের মেয়েই ও বাড়ি গিয়ে বেশি চোটপাট করছে, আমি চাকর, তাই সারাক্ষণ কেবল আমাকে চোখ রাঙায়।'

'বাবুর আশকারা পেয়েছে।' মদন একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'ঐ কথাটাই দাদাকে বলব বলে ছাতিম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে পড়লাম।'

'কোন্ কথা!' ঢেমনা যেন নতুন কথা শুনতে চাইছিল, মদনের চোখ দুটো ভাল করে দেখল।

'খুব সাজগোজ বেড়ে গেছে ছুঁড়ির', মদন থুথু ফেলল। 'ছনো মাখে, কিরিম ঘষে মুখে, বাহারের শাড়ি বেলাউজ গায়ে, পায়ে নকশা করা জুতো। গাব সেদ্দ করে জাল রং করত, পচা মাছের পেট বার করে শুঁটকি দিত, সেই ছুঁড়িকে এখন চেনা যায় না।'

'হুঁ, রাতারাতি ভোল পাল্টে গেছে, ঠিকই বলেছ ভাই, লখিন্দরের মেয়ে কেউ বলবে না এখন, তাই তো আমি নাম দিয়েছি বাবুনি, তার মানে বিবি, যেমন মেজাজ তেমন চালচলন।' ঢেমনা গলার নিচে হাসল।

'তা না হয় ভাল ভাল শাড়ি-বেলাউজ পরল, জুতো পায়ে হাঁটল, কিন্তু কিনা এমন সব কীর্তি করছে দেখলে চোখ কপালে ওঠে দাদা —'

'কি কীর্তি ভাই?' নতুন করে কীর্তির কথা শুনতে ঢেমনা দু কান খাড়া করে ধরল।

'পরাশর বিল থেকে ফিরছিল কাল সন্ধ্যেবেলা, হুঁ আমাদের

জাতভাই, আমার দোস্ত—বাবুদের বাগানের পেছন দিকের জাঙাল ধরে রেল ইস্টিশনে যাবে, তার কুটুম আসবার কথা বনগাঁ থেকে, বাগানের ভেতর আচমকা খিলখিল হাসির আওয়াজ শুনে সুপুরি-গাছের বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখল, কে এমন ভর-সন্ধ্যেয় মজার হাসি হাসে। মেয়েছেলের গলা, তাই পরাশরের মেজাজ গরম হয়ে গেল, অল্পবয়সের ছোঁড়া, আমার বয়সী, আমার চেয়েও দেখতে তাগড়া, এই বুকের ছাতি, এই পুরু গর্দান—'

'তারপর? কী দেখল উঁকি দিয়ে ভেতরে?'

'তোমার বাবু কুন্তিকে জড়িয়ে ধরে আচ্ছা করে চুমু খাচ্ছে, নয়া কাঠের বেঞ্চি বিছিয়েছে বাবু বাগানে, আমাদের পেহ্লাদ ছুতোরের হাতের তৈরি বেঞ্চি, এই তো দু চার দিন আগে চারখানা বেঞ্চি বাগানের চার কোণায় বসিয়ে দিয়ে এসেছে পেহ্লাদ দাদা, আমার সঙ্গে পরশু নারাণপুরের হাটে দেখা, বললে ভাল মজুরী পেয়েছে—'

'হুঁ, তারপর?' ঢেমনা মেরুদাঁড়া সোজা করে বসল। তার হাতের বিড়ি নিভে গেছে। বিড়ি টানতে ভুলে গেছে। মদনের দিক থেকে চোখ দুটি ফেরাতে পারছে না।

'ঐ যে', মদন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল, 'পরাশর দাঁড়িয়ে থেকে কীর্তিটা দেখল। বেঞ্চির ওপর বাবু, বাবুর গা ঘেঁষে কুন্তি বসে আছে, বাবু দু-দু'বার কুন্তিকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বেশ ভাল করে চুমু খেয়েছে আর বেলাজ মেয়ে খিলখিল করে হাসছে।'

ঢেমনার মেরুদাঁড়ায় একটা ঠাণ্ডা স্রোতের কাঁপুনি লাগল। অথচ গনগন করছিল আশ্বিনের রোদ। মাথার ওপর গাছের ডালে পাখির কিচকিচি শব্দ আর থামছিল না। কতক্ষণ কেমন যেন গুম মেরে রইল ঢেমনা। মদন আর একটা বিড়ি ধরিয়ে জোরে টানতে শুরু করেছে।

'হুঁ', দু বার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ঢেমনা বলল, 'ঐ

কথাটাই ঠিক বলেছ ভাই, বেলাজ মেয়ে তোমাদের লখিন্দরের বেটির লজ্জা শরম বলতে কিছু নেই—একেবারে নষ্ট মেয়ে, এখানে এসে অবদি তো আমি দেখছি—'

'উহুঁ, ও কথা বলো না দাদা, তোমার ওই কথাটা ঠিক হল না। তোমরা শহুরে মানুষ, তোমাদের নিন্দা করছি না, তুমি তো সোনার মানুষ। সবাই বলছে তোমার মতন একটা খাঁটি লোক, বিশ্বাসী লোক খুব কম দেখা যায়, সারাদিন মুখটি বুজে বাবুর কামকাজ করছ, তবে কিনা তোমার ঐ বাবুর পয়সার গরম, তাই তেনার যা মনে চাইছে তাই করছে—হুঁ, ঐ বাবু এসে কুন্তির মাথাটা খেয়েছে, ছুঁড়িকে রাতারাতি নষ্ট করে দিল।'

'উহুঁ, কথাটা ঠিক হল না।' চেমনা জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'আমার বাবুর মতন অমন খাঁটি চরিত্তির লোক হয় না, আমি তো জানি, এক পাড়ার মানুষ আমরা, কোনদিন ডাইনে বাঁয়ে তাঁকে তাকাতে দেখিনি, পয়সাওলা বাপেরছেলে—কত কিছু করতে পারে, কলকাতা শহরে পয়সা দিলে কী না পাওয়া যায়, উঁহু, যাকে বলে একেবারে তুলসী গঙ্গাজলে ধোয়া ভেতরটা, একটা মেয়েছেলের দিকে চোখ তুলে চাওয়া কাকে বলে জানে না -আর এখানে মানুষটা আসতে না আসতে কেমন যেন হয়ে গেল—ঐ ডাইনী মেয়ে, ঐ বজ্জাত ছুঁড়ি আমার বাবুর মাথাটা নষ্ট করে দিয়েছে—বাবুর স্বভাবটাকে রাতারাতি বদলে দিয়েছে শয়তানী।'

'না দাদা, তুমি একচোখো মানুষ—তুমি তোমার বাবুর দোষ দেখতে চাইছ না—' মদন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল, চোখ লাল করে ফেলল। 'আমরা জানি কুন্তি কেমন মেয়ে, যেমন আগুনের মতন রং, তেমনি তার ভেতরটা, ভয়ানক তেজী, ভয়ানক শক্ত, কেউ হাত বাড়াতে গেলে হাত পুড়ে গেছে, বে লাইনে হাঁটতে জানত না।' রাগ করে নিভে যাওয়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মদন একটা গরম নিশ্বাস ফেলল, চুপ করে রইল একটু সময়, তারপর বলল, 'ঐ

তোমার বাবু, ওপরটা দেখলে মনে হয় কত যেন খাঁটি সোনা কিন্তু তা না, যাকে বলে পয়লা নম্বরের লম্পট—'

'এই, দেখ ভাই একটু সমালে-সুমলে কথাবার্তা বলবে, আমি তোমার সঙ্গে ভদ্রতা রেখেই কথা বলছি, কিন্তু তুমি আমার বাবুকে লম্পট-টম্পট ডাকতে আরম্ভ করেছ, তোমাদের মেয়ের দোষটা দেখছ না।'

'কেন দেখব', মদনের গলার স্বর চড়ে গেল। 'পাঁচটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে বিলের ধারে জাল শুকোত ছুঁড়ি, গাব সেদ্ধ করত, পচা মাছের পেট খুলে রোদে ছড়িয়ে দিত, উঁহু একটা দিন কোনোরকম গোলমাল হয়নি, সোমত্থ মেয়ে, আর আমরা উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরার দল। লখিন্দরের তো একটুখানি ব্যবসা না, কত বড় বিল ছিল তার, কত মাছ, কত কর্মচারী, আমি পরাশর বোধন বাসু রসিক নটবর আরো কতজন কুন্তির সঙ্গে মিলেমিশে আমরা জাল শুকিয়েছি, জালে গাবের কষ মাখিয়েছি। তারপর মাছ ধরা, বিলের জলে হৈ-হৈ করে সাঁতার কাটা—কুন্তি ঠিক সঙ্গে আছে, কেউ বলতে পারবে না, তার গায়ে কারো ছোঁয়া লেগেছে, কি এর ওর সঙ্গে ওর ফাজলামো ইয়ার্কি চলেছে—কচু পাতায় যেমন জল ধরে না, তেমনি এতগুলো বেটাছেলের সঙ্গে থেকেও ও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকত—আজ কিনা তোমার বাবুর কাছে গিয়ে অমন ফুলের মতন মেয়ে নষ্ট হয়ে গেল।'

'গেল কেন ওখানে,' ঢেমনাও ছেড়ে কথা বলল না, 'তোমাদের লখিন্দর মেয়েকে ঘুষ দিয়ে বাবুর কাছ থেকে বিলের খবরদারি চেয়ে নিয়ে গেছে। হুঁ, যুবতী মেয়ে দেখিয়ে বাবুর মন ভুলিয়েছে, ওদিকে বিল বেচে চল্লিশ হাজার টাকাও পেল, তবু কিনা তার বিলের নেশা—মেয়ের চেয়ে ঝিনুকডাঙার বিল বুড়োর কাছে বেশি আদরের, তবেই এখন বোঝ, চব্বিশঘণ্টা একটা জোয়ান ছুঁড়ি পুরুষ মানুষের কাছে থাকলে সেই পুরুষটারই বা মন চঞ্চল হতে কতক্ষণ—'

মদন মাথা নাড়ল।

'তা না হয় বুঝলাম লখিন্দরের দোষ —তার টাকার নেশা, বিলের নেশা—বাবুর ঘরে মেয়েছেলে নেই, মেয়েকে পাঠিয়েছিল বাবুর ঘর দোর গুছিয়ে দিতে, সময়মতো বাবুর খাওয়া হয় কিনা দেখাশোনা করতে, বাপের কথা কুন্তি ঠেলতে পারেনি, সরল মনে ওখানে গেছে, আর সুযোগ পেয়ে বাবু কিনা শাড়ি দিয়ে, জামা জুতো দিয়ে, ছনো কিরিম গন্ধ তেল মাখতে দিয়ে নষ্ট করে ফেলল। ওফ্ কাল সন্ধ্যাবেলা ইস্টিশানে যাবার সময় বাগানের ভিতর সেই দৃশ্য দেখে পরাশরের কি অবস্থা, উঁহু, ইস্টিশানে আর যাওয়া হল না তার, সোজা আমার কাছে চলে এল। হ্যারিকেন জ্বেলে আমি তখন ঘরে বসে বানান করে করে মহাভারতখানা পড়তে চেষ্টা করছিলাম। ঘটনাটা পরাশর খুঁটিয়ে বলল, তারপর মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করল। ঘরে খুঁটির গায়ে মাথাটা ঠুকল দুবার, তারপর সে কি কান্না! অঝোরে কান্না।

'কেন, কাঁদছিল কেন? ওই ছোঁড়ার এত মনে লাগবে কেন?' ঢেমনা কপাল কোঁচকাল।

একটু সময় চুপ থেকে মদন বলল, 'আহা মনে দুঃখ হবে না! বলেন কি দাদা। ও যে কুন্তিকে ভালবাসত, অবশ্য মনে মনেই ভালবেসেছে, মুখ ফুটে কিছু বলত না লখিন্দরের মেয়েকে, শহরে ছেলেদের মতন তো আর মেয়েছেলে নিয়ে বেলেল্লাপনা করতে শিখিনি আমরা, চোখে মুখে খৈ ফুটিয়ে কথা বলে মেয়ের মন ভেজাতেও জানি না, আমরা সবাই কুন্তিকে ভেতরে ভেতরে ভালবেসেছি, তবে কিনা পরাশরটাই বেশি পাগল হয়েছি', কৈবর্তের ছেলে হলে হবে কি, ছবি আঁকে চমৎকার। দুদিন কুন্তির মুখটা এঁকে এনে আমায় দেখিয়েছে, সে পটল-চোখ, তিল ফুলের মতো নাক, টুসটুসে ঠোঁট, একেবারে কুন্তির মুখ' —দম নিয়ে মদন আবার বলল, আর কাল চোখের ওপর সে দেখল কিনা

বাবুর বুকের ওপর কুন্তি মুখটা রাখছে, আর বাবু ঘাড় নামিয়ে দু-দু'বার—'

'নষ্ট মেয়ে, নষ্ট মেয়ে—ওই ছুঁড়ি আমার বাবুকে খারাপ করেছে, আমার বাবু ডাইনে বাঁয়ে তাকাত না—' তেলের টিন তুলে নিয়ে চেমনা উঠে দাঁড়াল।

'না দাদা ও কথা বলো না।' মদনও দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তোমার বাবুর পরিচয় আমরা পেয়ে গেছি—পয়সার গরম, মন যা চাইছে করছে, সেদিন নটবর গিয়েছিল বারাসতে মোকদ্দমার কাজে। নটবর নিজের চোখে দেখল, বাবু গট গট করে একটা সরাবের দোকানে গিয়ে ঢুকল, হুঁ বিলাতি সরাবের দোকান, তারপর খবরের কাগজে মুড়ে এতবড় বোতল হাতে করে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দু' চাকার ভটভটি গাড়িটা চালিয়ে গাঁয়ের দিকে ফিরল।'

'ওষুধ কিনে এনেছে।' চেমনা চোখ বুজে বলল, 'বাবুর কোমরে বেদনা আছে, ওষুধ কিনতে বারাসত যায়।'

'ঐ তো, এমন এক সাধের চাকর পেয়েছে বড়লোক মানুষটা, যা মনে ধরছে করে যাচ্ছে, কেন না মনিবের দোষ ঢাকতে চাকর হাজারগণ্ডা মিছা কথা বলবে, বাবু বেশ ভালই জেনে গেছে। কাজেই—'

'দেখ ভাই সামলে সুমলে কথা বলবে, আর একবার তোমায় সাবধান করছি, অমন চাকর চাকর বলবে না।'

'বলব, একশোবার বলব, তোমার মতন পা-চাটা চাকর দুটো আছে নাকি।'

'তবে রে শালা।' চেমনা বুঝি তেলের টিনটাই ছুড়ে মারছিল, মদন লাফিয়ে দূরে সরে গেল।

'আমরাও দেখে নেব, বুঝলি রে শালা, ভদ্রতা করে এতক্ষণ দাদা দাদা বলছিলাম—' দূরে গিয়ে মদন একটা হাত শূন্যে উঁচিয়ে

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল। 'তোকে দেখব, তোর বাবুকেও দেখব। তোর বাবুর ঘাড়ে কটা মাথা আছে আমরা সবাই মিলে দেখতে চাই। আমরা কৈবর্তর ছেলে, অন্যায় সহ্য করব না, আমাদের গাঁয়ে বসে আমাদের একটা মেয়েকে নিয়ে—' মদন লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জন করতে করতে পাশের ধান ক্ষেতে নেমে গেল। তারপর ক্ষেতের আল ধরে দৌড়াতে আরম্ভ করল।

ঢেমনার গলার ভিতর তেতো লাগছিল। দুবার ওয়াক করে থুথু ফেলল। তারপর কেমন যেন টলতে টলতে হাটের দিকে এগোতে লাগল।

তাই বলো, গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ের মেয়ে পীরিতির রস তারাও বোঝে। কেন বুঝবে না। ঐ রস সবাই বোঝে। হাঁস মুর্গী বোঝে না? গরু ছাগল বোঝে না? ফড়িং টিকটিকি বোঝে না?

তবে কিনা ওটা প্রকাশ করার ধরনধারণ, নিবেদন করার রীতি-নীতি এক এক জায়গায় এক একরকম। মানুষের একরকম, ফড়িং-এর একরকম, টিকটিকি আরশোলার আর একরকম।

না, এই জিনিসের রস ঢেমনা পায়নি। কেমন করে পাবে। সারা জীবন তাকে পেটের ভাবনা ভাবতে হয়েছে। নিজের পেট, বিধবা মায়ের পেট আবার ছোট দুটো ভাইবোনের পেট। আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কলকাতার রাস্তা চষে বেড়াতে হয়েছে। অন্নচিন্তা চমৎকারা। আর কোনো চিন্তা তার কাছে ঘেঁষতে দেয় নি।

তবে কিনা লখিন্দরের মেয়ের কাছে সেদিন বানিয়ে একটা পীরিতের গল্প বলে ফেলল সে। তা-ও শেষ রক্ষা করতে পারল না।

একটা লরী এনে ওখানেই কেচ্ছাটা শেষ করতে হল। আর যে বানিয়ে বলার ক্ষমতা ছিল না।

হুঁ, এক এক জায়গায় এক এক রকম।

ফড়িংয়ের একরকম, মানুষের এক রকম। শহরে এক রকম, গাঁয়ে একরকম।

তাই তো চেমনার অন্নচিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা ছিল না। তা বলে কি শহরের রাস্তায় ঘাটে ছেলেমেয়ে সে দেখেনি। অনেক দেখছে। কেউ শিস দিয়ে প্রেম জানায়, কেউ গান গেয়ে ওঠে। কলেজের মেয়ে, স্কুলের মেয়ে দেখলেই মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে জোরে সিটি মারতেও দেখল কত। হুঁ, রকের ওপর বসে থাকে তারা, রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায়, যখন বাড়ি থেকে বেরোবে বা বাস থেকে নামবে তখন চোখ টিপবে সুবিধে না হলে জানালা দিয়ে চিঠি ছুঁড়ে মারে। আর যদি কাছেই এসে গেল তো চলো চায়ের দোকানে, সিনেমায় চলো, নয়তো পার্কে ময়দানে বা আর কোন নিরালায়।

পয়সার গরম? এখানে পীরিতির আর এক চেহারা। গাড়িতে তুলে নিয়ে শুঁড়িখানায় চলো, হোটেলে ঘর ভাড়া কর। গাড়ি নেই তো ট্যাক্সি ডাকো।

—আমি যে কুমারী মেয়ে!

—তাতে কি। হরেক রকমের দাওয়াই সাজানো আছে শহরের ওষুধের দোকানগুলিতে। তোমাকে একবেলার জন্যও অ-কুমারী হতে দেবে না।

—আমি যে বিবাহিত!

—তাতে কি, বাড়ি গিয়ে গা ধুয়ে ফেলবে। কর্তা আপিস থেকে ফিরে এলে মিষ্টি হেসে গরম কফির পেয়ালা হাতে তুলে দেবে। সব দোষ কেটে যাবে।

—আমি যে বেশ্যা!

—এই জন্যই তো তোমার কাছে এলাম। অনেক ঠেকেঠকে,

অনেক ঘাটে ভেসে ভেসে এবার তো মোহানা পেলাম। তোমার অন্য রূপ, তোমার পীরিতির স্বাদ আলাদা।

—ঘরে বৌ আছে না?

—হুঁ, আছে। সে তো বাঁধানো পুকুর পাতকুয়া, রোজ সেখানে নাইতে ভাল লাগে? তুমি মুক্ত অবারিত, তুমি সমুদ্র, তাই এখানে ডুব দিতে এলাম।

এত সব শুনেছে ঢেমনা, চোখে দেখেছে। অলিতে গলিতে রকে ময়দানে পার্কে হোটেলের দরজায়, শুঁড়িখানার সামনে। শেষ দেখা দেখেছিল সার্পেনটাইন লেনে। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হয়েছিল। বাদলার রাত থমথম করছিল।

কিন্তু আজ যে সে অন্য গল্প শুনল।

পা-চাটা চাকর, তোমায় শালা দেখে নেব। শুনে ঢেমনার কপালের রগ কাঁপছিল, কান দিয়ে হল্কা ছুটছিল। মাথাটা বনবন করে ঘুরছিল।

কিন্তু তারপর সব থেমে গেল। ভিতরটা শান্ত হয়ে গেল। তার চোখের কোণায় জল এল। তাই তো, চাকরকে চাকর বলেছে, আর তো কিছু বলেনি ছোঁড়া। বরং আর যা বলেছে, কোনদিন সে শুনেছে, না দেখেছে? দেখেনি ঢেমনা, শোনেনি।

তার ইচ্ছা করছিল আবার কান পেতে গল্পটা শোনে, ছবিটা দেখে।

দশটা তাগড়া জোয়ান ছেলে ছুটোছুটি করে ভাদ্রের রোদে জাল শুকায়, শুকানো জাল আবার জলে ছুঁড়ে মারে, বিলের কালো জলে ছলছল শব্দ বাজে, তারা টানে, জালের সঙ্গে মাছ আসে, মাছের সঙ্গে শামুক গুগলি পানা শ্যাওলা—দশটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ে থাবলা মেরে মেরে জালের মাছ আলাদা করে হাঁড়িতে তুলে রাখে।

তারপর শামুক গুগলি ছাড়িয়ে ধরাধরি করে এতবড় জাল ডাঙ্গায় তুলে টান টান করে রৌদ্রে ছড়িয়ে দেয়। তারপর তারা জলে নেমে

সাঁতার কাটে, ডুব দেয়। ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে দূরে চলে যায়, তারপর আবার ভেসে ওঠে। দশটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ে, আগুনের মতন গায়ের রং। মেঘের মতন চুল। তারা মনে মনে তাকে ভালবাসে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না। ছোঁয়াছুঁয়ি নেই, চোখে ইশারা করতে কেউ জানে না। পদ্মপাতায় জলের মতন সকলের সঙ্গে মেয়ে হি-হি করে হাসে, সাঁতার কাটে। তারপর ডুব দিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। তখন দশটা ছেলেও সাঁতার কেটে তাকে ধরতে পারে না, পিছনে ছোটে। এই তাদের খেলা।

রক নেই পার্ক নেই ময়দান নেই, চায়ের দোকান নেই সিনেমা নেই। আছে শুধু মাথার ওপর প্রকাণ্ড একটা নীল আকাশ। কালো ছলছল বিলের জল। আর জল পিপির ডাক।

তবু তারা তাকে ভালবাসে। লুকিয়ে তার ছবি আঁকে। পটল চেরা চোখ, তিল ফুলের মত নাক, পাকা গোলাপ জামের মতন টুসটুসে ঠোঁট।

এভাবে তারা বড় হয়েছে, নাকের নিচে ভোমরার পাখার মতন চিকন কালো গোঁফ গজিয়েছে, ছাতি পুরু হয়েছে, কাঁধের মাংস ডেলা বাঁধতে শুরু করেছে এক এক জনের। আর ঠিক এখনই তাদের কাঁদতে হল।

একলা পরাশর কাঁদছে না, বোধন বাসু রসিক মদন নটবর—সবাই কাঁদছে, মাথার চুল ছিঁড়ছে, ঘরের খুঁটিতে তারা মাথা ঠুকছে।

তেলের টিন হাতে ঝুলিয়ে ঢেমনা জোরে পা চালাল। চাকর গাল খেয়ে তার একটুও খারাপ লাগছিল না।

যেন বাড়িটা বড় বেশি ঝিমিয়ে পড়েছে। সূর্য ডুবল। হাট থেকে ফিরতে দেরি করে ফেলল সে। ইচ্ছা করেই দেরি করল। তার মনে হচ্ছিল একটা পাপ পুরীতে ঢুকছে সে। তাই রান্নার তেল নিয়ে ফেরার সময় কতবার কত গাছতলায় দাঁড়িয়েছে, বসেছে। আর চিন্তা করেছে এভাবে আর কতদিন চলবে। আর যেন ধৈর্য রাখা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। অনেক বারুদ জমেছে। ভিতরে এবার সে ফেটে পড়ুক, দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ুক, নিমাইবাবু চমকে উঠে দেখুক, খাবরের কাজ করে ঢেমনা শেষ হয়ে যায়নি, দরকার হলে মানুষটা তেজ দেখাতে পারে, প্রতিবাদ করতে জানে, মুখ ফুটে কথা বলতে পারবে, এই অন্যায় সে সহ্য করবে না। দশটা কৈবর্ত ছোঁড়ার পক্ষ হয়ে সে তোমায় শিক্ষা দেবে, হুঁ, একটু আগে মদন ছোঁড়া যেমন শাসিয়ে গেল, কলকাতার বড় মানুষটার ঘাড়ে কটা মাথা আছে আমরা দেখে নেব।

উঠোনে পা দিয়ে ঢেমনা লক্ষ্য করল, বাবুর শোবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সেখানে বাঁধা কুকুর দুটো দাওয়ার সামনে বসে ধুঁকছে, মাঝে মাঝে কাঁইকুঁই আওয়াজ করে উঠে গায়ের মশা মাছি তাড়াতে চেষ্টা করছে।

রোদ নিবে যাওয়ার দরুন সারা উঠোনে একটা কালচে ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে, নেবু ঝোপের ওদিকটায় যেন এখনি অন্ধকার জমতে আরম্ভ করল। ঘরের পিছনে পেয়ারা গাছে ক'টা পাখি তখনো কিচকিচ করছিল। অন্য সব পাখিরা বাসায় ফিরে ইতিমধ্যে শান্ত হয়ে গেছে।

ঢেমনার পায়ের শব্দ পেয়ে কুকুর দুটো একবারে উঠে দাঁড়ায়। ঘনঘন লেজ নাড়তে থাকে, জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে গলায় ঘড়ঘড় শব্দ করতে আরম্ভ করে অর্থাৎ ঢেমনা বাড়ি নেই, তাদের এতটা সময় বেঁধে রাখা হয়েছে, সময়মত কেউ খেতে দেয়নি, নিজেরাও ছুটোছুটি করে এদিক ওদিক শিকার খুঁজে নেবে তারও পথ বন্ধ—নানাকারণে

ভিতরে রাগ দুঃখ অভিমান চেপে রেখে দুটিতে চুপচাপ বসে এতক্ষণ গুমরে মরছিল, ঢেমনার দেখা পেয়ে তারা খুশী হল, আশ্বস্ত হল, উত্তেজিত হয়ে শরীর কাঁপিয়ে জিভ বার করে জোরে লেজ নাড়তে শুরু করে দিল।

কিন্তু ঢেমনা দু'জনের একজনের দিকেও তাকাল না। অন্য সময় হলে ছুটে গিয়ে সে শিকল খুলে দিত, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে 'রাজা' 'বাহাদুর' দুই সর্দারকে আদর করত। তারা আনন্দে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার কোমর আঁকড়ে ধরত, তার হাত চাটত, শরীর চাটত।

আজ ঢেমনার মনের অবস্থা অন্যরকম। চোখ লাল করে বাবুর শোবার ঘরের দরজাটা এক নজরে দেখে সোজা রান্নাঘরের দিকে হেঁটে গেল সে। দরজার শিকল তুলে গিয়েছিল, শিকল নামিয়ে পাল্লা দুটো ফাঁক করতে ভক্ করে একটা পচা গন্ধ লাফিয়ে তার নাক উঠে এল। কারণটা বুঝল সে, কখন সেই মুর্গী কুটে ফেলে রেখে গেছে। হলুদ নুন মাখিয়ে রেখে গেলেও হ'ত, কিন্তু তা আর রাখা হয়নি। কাটা মাংস বাসি হয়ে এখন খারাপ গন্ধ ছাড়তে আরম্ভ করেছে। করুক। এই মাংস ঢেমনা খাবে না। যার জন্য রান্না হবে তার ভিতরটাও এমন পচা দুর্গন্ধময়।

সে ভেবেছিল নেবুতলার সেই বাদলার রাতের ঘটনার পর মানুষটার খুবই লজ্জা হয়েছে, অনুতাপ এসেছে। কিন্তু এখানে এসে ঢেমনা দেখল, কিছুই না। ভিতরটা একই রকম আছে। যেন আরো খারাপ হয়েছে, আরো অধঃপতন হয়েছে। দিনকতক পরে একটা পালিশ চড়িয়ে নিমাইবাবু ভালমানুষ সাজতে চেষ্টা করেছিল। ওপরের সেই পালিশ দেখে ঢেমনাও কেমন ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

এইজন্য ঢেমনারও আজ কম অনুতাপ হচ্ছে না। তেলের টিন নামিয়ে রেখে ভিজে গামছা দিয়ে সে কপালটা মুখটা মুছল।

আশ্বিনের সন্ধ্যার গুমট আরম্ভ হয়েছে। যেন বৃষ্টি হলে ভাল লাগত।

চোখ তুলে একবার সে জানালার বাইরেটা দেখল। অন্ধকারে গাছপালা ঝাপসা হয়ে গেছে। একটা দুটো জোনাকী এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে।

যাবার আগে সে কাঠ কেরোসিন হাতের কাছে নামিয়ে রেখে গিয়েছিল। এবার সব টেনে নিয়ে উননে আগুন দিতে বসল।

ভাত চাপিয়ে বাটনা বাটবে, তেল মশলা দিয়ে মাংস মাখবে। ভাত ফুটে গেলে মাংস চাপাবে।

কাঠ ধরাবার জন্য ঢেমনা দেশলাই খুঁজতে লাগল।

'ঢেমনা!'

পাশের দরজাটা নড়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে ঢেমনা দেশলাই জ্বালল। কিন্তু ফস্ করে কাঠিটা নিভে গেল। বিরক্ত হয়ে আবার সে দেশলাইয়ের কাঠি ঘসল।

'এই আমি ডাকছি, কানে যাচ্ছে না!'

এবার ঢেমনা চমকে উঠল। চেনা মানুষ, পরিচিত স্বর। কিন্তু তা হলেও তার মনে হল অন্য কেউ তাকে ডাকছে, সুরটা অন্যরকম। জলতরঙ্গের বাজনার মতন মিষ্টি আওয়াজ মোটা হয়ে গেছে, ঘোলাটে হয়ে গেছে।

'ঢেমনা!'

'কি চাইছিস!' বিরক্ত চোখে ঢেমনা দরজাটা দেখল। তারপর আর তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। চোখ গোল হয়ে গেল।

'কি দেখছিস, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?' অন্যদিনের মতন ঠোঁট মোচড়ানো হাসি না। হি-হি করে হাসল কুন্তি।

চোয়াল দুটো শক্ত করে রাখল ঢেমনা।

'ইস্, মুখ দিয়ে কথা সরছে না, মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। এই ঢেমনা!'

ঢেমনার বুক ঠেলে একটা গাঢ় নিশ্বাস উঠে এল। ঠিক এই

জিনিস সে আশা করেনি, এখানে আশা করেনি। গা টলছে মেয়েটার, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। চুলের সাজ নেই, গায়ের কাপড় এলোমেলো ঢিলেঢালা, সায়াটা বেরিয়ে আছে, জামার বোতাম খোলা।

তবে কি—আর ভাবতে হল না কিছু। পরিষ্কার একটা গন্ধ ঢেমনার নাকে লাগল, দাঁড়াতে পারছে না কুন্তি, চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে গলাটা এদিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে খিল খিল করে হাসতে লাগল। 'এমন করে চেয়ে আছিস মাইরি, মনে হচ্ছে তুই একটা বাঘ, সোঁদর বনের বাঘ, যেন এখনি লাফিয়ে ঘাড়ে পড়বি, তারপর আমার রক্ত চুষে খাবি হি-হিহি-হি—'

'এখান থেকে তুই সরে যা।' গলার রগ ফুলে উঠল ঢেমনার, নাকের ডগা কুঁকচে গেল। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না কিন্তু না বলে যেন উপায় ছিল না। 'মদ খেয়েছিস।'

'এট্টুখানি,—একটুকুন, আমার আঙুলের একটা কড়ার সমান।' একটা আঙুল ঢেমনার চোখের সামনে তুলে ধরে কুন্তি টেনে টেনে হাসতে লাগল।

'কে দিয়েছে তোকে মদ?'

'বাবু, তোর মনিব, এইটুকুন ঢেলে দিয়েছিল কাচের গেলাসে, তুই বিশ্বাস কর।'

যেন কেউ ঢেমনার বুকে হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিচ্ছিল।

'তুই সরে দাঁড়া।' ঢেমনা চৌকাঠের দিকে পা বাড়াল।

'কোথায় যাবি?' কুন্তি নড়ে না, আর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে দরজা আগলে রাখে। 'এখন ওঘরে যেতে পারবি না।'

'কেন!'

'বাবু খাচ্ছে, গেলাস বোতলের ঠুনঠুন্ শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না।'

'বাবু খাচ্ছে কি খাচ্ছে না সে আমি দেখব। তুই আমায় রাস্তা দে।'

'ইস্, এমন করছিস, যেন ক্ষ্যাপা বাঘ হয়ে আছিস, যেন একটা মানুষের ওপর লাফিয়ে পড়ে এখনি ঘাড় ভেঙে রক্ত চুষে খাবি।'

'আমি বলছি তোকে, ভালয় ভালয় সরে দাঁড়া।'

'উঁহু, ওখানে গিয়ে আমি তোকে হামলা করতে দেব না। যা বলার আমায় বল্। আমার ঘাড় ভাঙবি—আমার রক্ত চুষে খাবি?. খা, খেয়ে ছাখ, একটুও নোনতা না, হি-হি লোকে বলে মানুষের রক্ত নোনতা। আমার রক্তে মিষ্টি মধু ছাড়া আর কিছু নেই। ছাখ্, খেয়ে ছাখ্।' ফর্সা লম্বা গলাটা ঢেমনার মুখের সামনে বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল লখিন্দরের মেয়ে।

'শয়তানী বজ্জাত মেয়ে!' হাতটা সরিয়ে দিয়ে ঢেমনা পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল।

না, পাশের ঘরে অর্থাৎ বাবুর শোবার ঘরে না, তার পাশে আর একটা ছোট ঘর অর্থাৎ যে ঘর কুন্তির জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে ছোট একটা টেবিলে বোতল গেলাস রেখে বাবু একলা চুপ করে বসে আছে। বাবুর হাতে একটা গেলাসে মদ টলটল করছে, ছোট একটা হ্যারিকেন জ্বলছে এক পাশে, বাবুর বাঁ হাতে সিগারেট জ্বলছে। পাশে একটা শূন্য চেয়ার। বোঝা যায়, একটু আগে ওই চেয়ারে মেয়েটাকে বসিয়ে দিয়ে তার হাতে মদের গেলাস তুলে দেওয়া হয়েছিল। ঢেমনার পায়ের শব্দ শুনে বাবুর যেন চমক ভাঙল। নড়েচড়ে উঠল। কিন্তু ঘাড় ঘোরাল না। পিছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে দেখল না।

'কুন্তি এলি!' বাবু তাই ভাবল। 'চাকরের ঘরে এতটা সময় কী করিস শুনি?'

ঢেমনা জবাব দিল না। একটা গরম নিশ্বাস ফেলল।

'মাংস হয়েছে রে কুন্তি?'

'মাংস হবে না, মাংস চাপানো হয়নি।' ঢেমনা কথা বলল।

এবার বাবু ঘাড় ফেরাল।

'অ, তুই?' গেলাসের পানীয়টুকু গলায় ঢেলে বাবু গেলাসটা টেবিলে রাখল। তারপর ভুরু কোঁচকাল। 'কেন হবে না কেন, সেই কখন মুর্গী কাটা হয়েছে, ছোলা হয়েছে—সারাদিন তুই করছিলি কী?'

'হাটে গিয়েছিলাম, তেল মশলা ছিল না।'

'অ, সারাদিন হাটেই কাটিয়ে এলি।'

ঢেমনা উত্তর করল না।

'যা, ভূতের মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন—গিয়ে মাংস চাপিয়ে দে, আর ওই শালীকে কানে ধরে এঘরে পাঠিয়ে দে, ওখানে কী করছিল?'

'মাতলামী করছিল।'

বাবু গলা কাঁপিয়ে হাসল।

'একটুখানি পেটে না পড়তেই ছুঁড়ি এমন আরম্ভ করছে!'

'তা তো করবেই।' আর সহ্য হল না ঢেমনার, গর্জন করে উঠল। 'তোর এক পিপে গেলেও কিছু হয় না, তোর কিছুতেই কিছু হয় না, তোর লজ্জা নেই ভয় নেই, নেই সম্মান অসম্মান, ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি—সব গুলে খেয়ে এখন এই পাড়া গাঁয়ে এসে বিষ ছড়াতে আরম্ভ করেছিস।'

কিন্তু বাবু তাতে থামল না। বরং ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে গেলাসে আবার মদ ঢেলে দিল।

তারপর বড় করে একটা চুমুক দিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে ঢেমনাকে দেখল।

'হুঁ বল্, থামলি কেন, বলে যা—'

'তুই যে এতবড় শয়তান আমার জানা ছিল না।'

'কেন, মদ খেয়ে মেয়ে নিয়ে একদিন গাড়ি চালাতে গিয়ে সার্পেনটাইন লেনে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম, আমার পরিচয় তো তুই সেদিন পেয়েছিলি।' নিমাই হাসল। হেসে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

'হুঁ পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম বৈকি—' ঢেমনার উত্তেজনা একটুও হ্রাস পেল না। 'কিন্তু সেদিনের সেই কেলেঙ্কারীর পর ভেবেছিলাম তোর ভেতরে অনুতাপ এসেছে, লজ্জা এসেছে। নিজের ওপর একটা ঘেন্না এসেছে, এবার নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করবি।'

'তোর যেমন কথা।' নিমাই চেয়ারের পিঠে মাথাটা রাখল। 'মেয়েব স্বাদ, মদের স্বাদ যে একবার পেয়েছে সে জীবনে আব কখনো এসব জিনিস ছাড়তে পারে, আমি বিশ্বাস করি না, যদি কেউ বলে যে আমি ছেড়ে দিয়েছি, আমি বলব শালা, মিথ্যাবাদী, ভণ্ডামি করছে।'

'তো তুই কলকাতা ছেড়ে এখানে চলে এলি কেন? বাবাকে বললি মাছের ব্যবসা করবি, এক কাঁড়ি টাকাও নিয়ে এলি, তারপর বিল কেনবার নাম করে সেই টাকা কার হাতে তুলে দিলি, কেন তুলে দিলি সে তো চোখের ওপর দেখলাম—'

'বাবার অনেক টাকা, বুঝলি—দু-দুটো কারখানা চালিয়ে বাবা আমাদের এত টাকা করেছে, আরো করবে, যতকাল আমাদের করাত কল গেঞ্জির কল চালু থাকবে খালের জলের মতন আমাদের ঘরে টাকা আসবে। বাপের এক ছেলে। দুহাতে উড়িয়েও আমি এত টাকা এক জীবনে শেষ করতে পারব না। কাজেই ফুর্তি করছি, আনন্দ করছি। ঝিনুকডাঙার বিল কেনার নাম করে লখিন্দরকে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে, সে তো বাবার একটিপ নস্যি। এই নিয়ে বাবাও কোনোদিন দুঃখ করবে না। আমি তো নয়ই।' মাথা তুলে নিমাই গেলাসে চুমুক দিল।

স্তম্ভিত হয়ে শুনল ঢেমনা। যেন এরপর তার আর কিছু বলার ছিল না। অবাক হয়ে ভাবছিল সে, এই মানুষ একদিন

ছোট ছিল, তার খেলার সাথী হয়ে তার সঙ্গে ঘুড়ি উড়িয়েছে, মাছ ধরেছে। অবাক লাগছিল তার, এখানে আসবার আগে এই মানুষ তার বস্তির নোংরা ঘরে ঢুকে তার ময়লা বিছানার ওপর চুপ করে বসে থাকত—একটি ক্লান্ত বিষণ্ণ মূর্তি, অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে, জীবনের উৎসাহ আনন্দ হারিয়ে মনমরা হয়ে আছে, ধরে নিয়ে ঢেমনার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার শেষ ছিল না, ভাবত সে কেমন করে বাল্যবন্ধুকে সাহায্য করবে, তার মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি, মুখের সহজ হাসি ফিরিয়ে আনতে কী করা যেতে পারে, চিন্তা করে সে অস্থির হয়ে পড়েছিল।

হুঁ, এই মানুষ! তার ভেতরটা যে এত শক্ত এত নির্লজ্জ, এমন নিষ্ঠুর, যদি একদিন ঢেমনা টের পেত!

'বেশ তো।' ঢেমনা বুঝতে পারল তর্জন গর্জনে কাজ হবে না, উত্তেজিত হয়ে শয়তানকে বশ মানানো যাবে না, গলার স্বর খাদে নেমে এল তার, যেন হঠাৎ নিজেকে অস্ত্রহীন দুর্বল অসহায় মনে করতে লাগল সে। 'বেশ তো—' একটা তেতো ঢোক গিলে ঢেমনা আস্তে বলল, 'বাবার অনেক টাকা, আর সেই টাকা যখন ইচ্ছামতন ওড়াবার স্বাধীনতা তোর আছে, কলকাতা ছেড়ে চলে এলি কেন! সেখানে অনেক মেয়ে, ফুর্তি করার অনেক জায়গা ছড়িয়ে আছে।'

'হুঁ, তা আছে, কিন্তু শেষটায় অসুবিধা কেন দাঁড়াল জানিস,' আর এক ঢোক মদ গিলে নিয়ে নিমাই মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল, একটা সিগারেট ধরিয়ে ঢেমনার মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'সেদিন সার্পেনটাইন লেনের ওরা ভালমানুষী দেখিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তলে তলে তারা পুলিশে খবর দিয়েছিল। হুঁ, বেলেঘাটা থানায় খবর পাঠিয়েছিল। এখন বেলেঘাটার ও সি হল বাবার যাকে বলে একেবারে হাতের লোক—কাজেই ব্যাপারটা সেখানেই চুকে গেল, কিন্তু তা হলেও বাবার কানে কথাটা উঠল, সেই শুয়ার ও-সিটা

হেসে হেসে এমনভাবে বাবার কাছে কথাটা তুলল, যেন এর আগেও আমি অনেক কেলেঙ্কারী করেছি, মাছি হয়ে কেবল ময়লার ওপর রাতদিন ঘুর ঘুর করা আমার স্বভাব, পুলিশের খাতায় আমার নাম রয়েছে, কাজেই আমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবং বাবার সুনামের কথা ভেবে ওই শালা মস্ত এক শুভানুধ্যায়ী সেজে বাবাকে পরামর্শ দিতে লাগল যাতে দিনকতক কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়—'

'তারপর ?'

'বাবা সরাসরি আমাকে মুখে কিছু বলত না, চুপ করে থাকত, বাবার চোখ দুটোর দিকে তাকালে আমার কেমন কষ্ট হত।'

'কিসের কষ্ট, তুই যদি বুড়োর মনের দিকে তাকাবি তো এখানে এসব করতিস না।'

'তোর মাথায় যদি ছটাক পরিমাণ বুদ্ধি থাকত।' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল নিমাই। 'চোখের ওপর বুড়ো মন খারাপ করে বসে থাকে, দেখে খারাপ লাগে না ? তাছাড়া আমার সবচেয়ে অসুবিধা হল, এই অবস্থায় যখন তখন টাকা চাইতে পারছি না, উঁহু মার কাছেও না, মা-ও মন খারাপ করে থাকত, কাজেই ঠিক করলাম, একেবারে ওদের গায়ের সঙ্গে লেগে থেকে আপাতত কিছু না করাই ভাল। দিনকতক দূরে সরে থাকি। ওই বুড়ো বুড়ি আর ক'দিন, চিন্তা করলাম। তারপর তো শালা আমিই সব।'

'অ, হাতে টাকা থাকত না বলেই মুখ বেজার করে আমার কাছে গিয়ে বসে থাকতিস্।'

'তা তো বুঝতেই পারিস, ওটাই আসল জিনিস, টাকা ছাড়া আমার এক পা এগোবার উপায় আছে ? যে লাইন ধরেছি— হি-হি। তাই মাথায় বুদ্ধি এল, দেশে চলে যাই। চাষবাসের কাজ দেখব, মাছের চাষ করব, তখন আর টাকার অভাব হবে না।'

ঢেমনা একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। চুপ করে থাকল কতক্ষণ।

'যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গিয়ে তুই চট করে মুর্গীর ঝোলটা

নামিয়ে দে, মাংস ছাড়া মদ জমে না।' নিমু নতুন করে গেলাসে মদ ঢালল। 'আর কুন্তিকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিবি। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে শালী করছে কি?'

ঢেমনার মাথার ভিতর আবার আগুন জ্বলে উঠল। গলার স্বর কঠিন হয়ে গেল। মুখটা বিকৃত করে ফেলল। 'একটা কথা তোকে আমি না বলে পারছি না। নিমু, তোর বাবার অনেক টাকা, তুই যেভাবে খুশী ওড়া, আমার কিছু বলবার নেই—কিন্তু এই নিরীহ মেয়েটাকে তুই নষ্ট করলি কেন, বাপটাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে মেয়েটাকে কাছে রাখলি তোর ঘরে কাজকর্ম করবে বলে, আর সুযোগ পেয়ে তুই—'

'আমি তো বলিনি, আমি ডেকে আনিনি লখিন্দরের মেয়েকে। মেয়ে নিজে থেকে এসেছে। হুঁ, স্বার্থের খাতিরে বাবাই গরজ করে মেয়েটাকে রেখে গেল, আমার খাওয়া পরা দেখবে, ঘরদোর গুছোবে—' সবকটা দাঁত বের করে নিমাই হাসল। 'মাইরি, তুই একবার চিন্তা করে ছাখ ঢেমনা, আমার কিছুই দোষ নেই, পতঙ্গ যদি ধেয়ে ধেয়ে আলোর কাছে আসে—'

'চুপ কর রাস্কেল! স্বার্থের খাতিরে লখিন্দর মেয়েকে এ বাড়ি রেখেছিল তোর ঘরের কাজকর্ম করবে বলে, যেমন মানুষ ঝি-চাকরানী রাখে—তোর সুখ সুবিধার জন্য ওকে এখানে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু লখিন্দর জানত না যে, তুই মেয়েটাকে তোর বিছানায় তুলে নিবি, তাকে জোর করে ধরে মদ খাওয়াবি—'

'ওফ্, তোর দেখছি খুবই লাগছে, কেন, কাজকর্ম করতে তুইই তো আছিস। একটা মানুষের ক'টা ঝি চাকর লাগে?'

'হুঁ, আমি তো চাকর আছিই, আমার ডিউটি আমি ঠিকই করে যাচ্ছি।' ঢেমনা আবার দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। যেন কেউ ছুরি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ডটা কেটে তছনছ করছিল। অথচ যন্ত্রণা জানাতে একটু চিৎকার করতে পারছিল না সে। যেন এতবড় ধৈর্যের পরীক্ষা

জীবনে আর সে কোনোদিন দেয়নি। 'হুঁ, বুড়ো কর্তাকে যখন কথা দিয়ে এসেছি, যতক্ষণ আমি এখানে আছি কাজ করেই খাব, কাজ না করে একমুঠো ভাতও আমি মুখে তুলব না—মালিককে রেঁধে বেড়ে খাইয়ে তারপর চাকর খায়, এই নিয়ম আমি ঠিকই মেনে চলেছি, তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের একটা সরল মেয়ের এমন সর্বনাশ করলি। তা-ও জেলের মেয়ে, নিজের রুচি, মান মর্যাদা কোথায় নামিয়ে এনেছিস অবাক হয়ে ভাবি।' একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে ঢেমনা হাঁপাতে লাগল। নিমাই শব্দ করে হাসল।

'আমার সব কিছুতেই রুচি আছে—শহরের মেয়ে গাঁয়ের মেয়ে, হাতের কাছে পেলে আমি কোনো মেয়েই বাদ দিই না। আর মেয়েছেলের ব্যাপারে মান-মর্যাদার ধার আমি কমই ধারি।'

'তোর মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘেন্না করছে।' ঢেমনা অন্য দিকে চোখটা সরিয়ে নিল।

'ঘেন্না করে তাকাবি না', এবার নিমাই হাসল না। 'তোর তো এ ঘরে আসবার কথা না—তোর যা কাজ তাই কর গে, আমায় নিরিবিলি খেতে দে—কুন্তিকে এঘরে পাঠিয়ে দে।'

'কিন্তু বুড়োকর্তাকে গিয়ে আমি কী বলব? কর্তা বিশ্বাস করে আমায় এখানে পাঠিয়েছিল।' ঢেমনার চোখদুটো ধকধক করে উঠল। যেন নিজের মনে সে কথা বলছিল। 'তখনি কি জানতাম তাঁর লায়েক ছেলের ভেতরটা এত জঘন্য, এত নোংরা আর সেই ছেলের জামীনদার হয়ে গরুর মতন আমি এখানে ছুটে এলাম।'

'বুড়োকর্তাকে তোর কিছুই বলতে হবে না। আমার দায়িত্ব আমি নিজেই নিতে জানি। তোর না পোষায় তুই ফিরে যা, গিয়ে আবার রুটির গাড়ি ঠেল। এত কথা এখানে বলবি না।'

'যাব না, যাবার জন্য আসিনি।' ঢেমনা গর্জন করে উঠল। নিমাইয়ের চোখের দিকে চোখ রেখে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

যেন তার শরীরের সব কটা শিরা উপশিরা চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। একটা হাত শূন্যে তুলে সে নাচাতে আরম্ভ করল। 'আমি শেষ পর্যন্ত এখানে থাকব—থেকে দেখব, তোর ধর্ম তোকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। একদিন মহাবিপদে পড়েছিলি, আমি বাঁচিয়েছিলাম। আজ ভুলে গেছিস—আজ', ঢেমনার গলার স্বর হঠাৎ খাদে নেমে এল, যেন সমস্ত উত্তেজনা চোখের নিমেষে দলা পাকিয়ে তারপর গলতে আরম্ভ করল। দু হাতে চোখ ঢেকে সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। 'একটা চাকরের অধম হয়ে ছিলাম এখানে, আর আজ কিনা মুখের ওপর বলছিস, তুই চলে যা, কলকাতায় ফিরে গিয়ে রুটির গাড়ি চালা।'

'এই ভ্যাখো, সেন্টিমেন্টাল ফুল!' ঢেমনার তর্জন গর্জন শুনে তারপর মানুষটাকে কাঁদতে দেখে নিমাই ভুরু নাচিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে নতুন করে হাসতে আরম্ভ করল।

'একটা কথার কথা বললাম, তুই না হয় কলকাতা ফিরে যা, আর অমনি ওটাকে ঠিক ধরে নিয়ে—অথচ আমি জানি তুই চলে গেলে আমাকে যেমন অসুবিধায় পড়তে হবে, রীতিমত আমাকে বিপদে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া হবে, কেমন ঠিক বলছি কিনা।' ঢেমনার মুখের দিকে তাকাল নিমাই। যেন তাকে সান্ত্বনা দিল। চোখ থেকে হাত নামিয়ে ঢেমনা একচোখে মেঝেটা দেখছিল।

'আর তুই যদি মনে করিস', নিমাই বলে চলল, 'ওই যে বললি জেলের মেয়ে—চিরকাল আমি তাকে গলার মালা করে রাখব, তো আমার ওপর ভয়ানক অবিচার করা হবে ঢেমু। ঠিক দু'দিন, দুদিন থেকে চারদিন, বাস্, তারপর রসটুকু খাওয়া হয়ে গেলে আখের ছিবড়ে যেমন লোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আমিও ফেলে দেব, ছেড়ে দেব, তুই নিজের চোখে দেখবি।'

'ওফ্, শয়তান, কতবড় শয়তান তুমি নিমাইবাবু, মেয়েটার সর্বনাশ করে তারপর আখের ছিবড়ের মতন ছুঁড়ে ফেলে দেবে—

অ্যা, আর আমি দাঁড়িয়ে থেকে তাই দেখব!' মাথাটা দুবার ঝাঁকিয়ে ঢেমনা লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'এই শোন্ শোন্!' নিমাই পিছনে ডাকল। ঢেমনা শুনল না, দাঁড়াল না, শোবার ঘর পার হয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। চৌকাঠের কাছে শুয়ে পড়েছে কুন্তি। ওদিক থেকে কেরোসিনের ডিবির লাল আলোটা এসে মুখে পড়েছে। পাতলা ঠোঁট দুটো সামান্য ছড়ানো, তাই ছোট একটা হাঁ হয়ে আছে মুখটা, দুটো চোখ বোজা, ঢেমনা নুয়ে মুখের কাছে মুখটা নিয়ে তখনই আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছুঁড়ি। নেশার ঘুম। মাথার গোছা গোছা চুল মাটিতে লুটোচ্ছে, হাঁটুর কাছে সায়াটা সরে গেছে, শিশুর মতন নির্লোম মসৃণ চকচকে একটা হাঁটু। এখন ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে কত ছোট, কেমন অবোধ অসহায় মনে হচ্ছে, যখন সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে, মনে হয় সাংঘাতিক একটি পাকা সেয়ানা মেয়ে, যেন পৃথিবীর সব কিছু বোঝা হয়ে গেছে, জানা হয়ে গেছে—আসলে যে ও কত অজ্ঞান কত অবুঝ, এখন বোঝা যায়। ঢেমনার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। তাই তো, অবোধ না হলে এখানে এসে ক'দিনের মধ্যে শয়তানের পাপচক্রে নিজেকে এমন জড়িয়ে ফেলল—।

ঢেমনা আবার নুয়ে মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গেল। একটা বাদলা পোকা উড়ে এসে কুন্তির গালে বসেছে। আঙুলের টোকা দিয়ে ঢেমনা পোকাটা সরিয়ে দিল। গালে তার হাত ঠেকল। কুন্তি জাগল না। বরং যেন ঠোঁট দুটো আর একটু ছড়িয়ে দিয়ে স্বপ্নের ঘোরে একবার হাসল।

দুটো দিন বেশ একটু ব্যস্ততার মধ্যে কাটল নিমাইবাবুর। ছুটে ছুটে কলকাতা গেল আবার ফিরে এল। যেন স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরার সময় থাকে না। ধৈর্য থাকে না। মোটর বাইক ছুটিয়ে ভোর বেলা বেরিয়ে গেছে, বিকালে ফিরে এসেছে। শ্রান্ত ঘর্মাক্ত চেহারা। ঢেমনার সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখটা নামিয়ে নেয়। জিজ্ঞেস করলে বলে, জরুরী কাজে কলকাতা যেতে হয়েছিল। একদিনই ঢেমনা জিজ্ঞেস করেছিল। জরুরী কাজটা কী ঢেমনা আর জানতে চায় নি। এমনিও তার সঙ্গে বাবু কথা বলছে না। যেন সেদিন রাত্রে কথা কাটাকাটি চটাচটি হবার পর এটা হয়েছে। রাগ হয়েছে বাবুর? অভিমান? ঢেমনার যেন মনে হয় অভিমানই হয়েছে। কেননা কুন্তির সঙ্গে মাতামাতির মাত্রাটাও যেন বেশ কমে গেল। তেমন কথায় কথায় তাকে ডাকছিল না, শোবার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আটকে রেখে হাসাহাসি ফিসফিস গুজগুজ করছিল না। না, সন্ধ্যার পর বোতল নিয়ে বসতেও বাবুকে আর দেখল না ঢেমনা। হুঁ, অভিমান করেছে, হয়তো ভিতরে ভিতরে একটু লজ্জাও পেয়েছে। ঢেমনা তো ছেড়ে কথা বলেনি। যতটা বলার সে বলেছে। তার পরেও যদি মানুষের চোখ না খোলে—লজ্জা না হয়—

কাজেই ঢেমনা একটু নিশ্চিন্ত হল। হয়তো বাবু নিজেকে শোধরাতে চেষ্টা করছে।

'বাবু এমন ছুটে ছুটে কলকাতা যাচ্ছে কেন রে ঢেমনা?'

'আমি জানি না।'

'আমার যেন মনে হয় একটা কিছু মতলব এঁটেছে—'

'জিজ্ঞেস করলেই পারিস।' ঢেমনা চোখ তুলল না। রান্নাঘরের লাগোয়া পেয়ারা গাছটার ছায়ায় বসে সে কাঠ কাটছিল। দুদিনের মধ্যে একবারও ছুঁড়ি তার সামনে আসেনি। কারণটা ঢেমনা ঠিক

বুঝতে পারছিল না। না কি বাবু তেমন ঘন ঘন ডাকছেনা, আদর-টাদর করছে না বলে মনে দুঃখ হয়েছে, একলা শুয়ে কাটাচ্ছে নিজের ঘরে? যেন তেমন একটা সাজগোজ করতেও দেখা যাচ্ছে না। কথায় কথায় ঢেমনার সামনে ছুটে এসে আর রং ঢংও করছে না। ঢেমনা খুশী। এবার যদি বজ্জাত মেয়ের চোখ খোলে।

এসব খেলা যে দুদিনের, এই আমোদ ফুর্তি শখ আহ্লাদ সাজ পোশাক খাওয়া দাওয়া সবই বালির ওপর দাঁড়িয়ে, হুঁ, যে কোনো মুহূর্তে পায়ের নিচের বালি সরে গেলে পাতালের অন্ধকারে ডুবে যেতে হবে, লখিন্দরের মেয়ে তাহলে বুঝতে আরম্ভ করেছে। নাকি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঢেমনার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে ছুঁড়ি দমে গেছে? হুঁস হওয়ার পর বুঝতে পেরেছে এই লজ্জার শেষ নেই? তারপর ঢেমনার সামনে আর মুখ দেখানো চলে না? শত হোক গেরস্থ ঘরের মেয়ে সে, কুমারী। বাবুর পয়সায় জামা কাপড় পরুক কি মুখে ক্রীম পাউডার মাখুক—হুঁ, না হয় একটা আংটিও বাবু উপহার দিল—কিন্তু এভাবে তার সঙ্গে একত্র বসে মদ খাওয়া? কোন জাতের মেয়েরা এসব করে?

অর্থাৎ ঢেমনার কাছে কিছুই ঢাকাচাপা রইল না, সব বুঝে গেছে সে, চাকর—কিন্তু তা হলেও তো পুরুষ, একটা জোয়ান ছেলে—আর একটা পুরুষের সঙ্গে কুকীর্তি করে তারপর তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ছুঁড়ির লজ্জা তো করবেই, নিশ্চয় ভয়ও করছে এখন।

'ঢেমনা!'

'আমার সঙ্গে তুই কথা বলবি না—আমি কাজ করছি।'

অন্যদিন হলে কুন্তি এর মধ্যেই হেসে কুটিকুটি হত, ঠোঁট মোচড় দিয়ে বলত, 'তুই আমায় হিংসে করিস, কেন যে তুই আমায় দেখতে পারিস না—' কিন্তু আজ আর হিংসে করবে কি, কাঠ কাটা বন্ধ রেখে চোখ তুলে একনজরে দেখে ঢেমনা বুঝল, বাসি ফুলের মতন মুখটা সিঁটিয়ে গেছে। চুল বাঁধেনি, যেন কাল থেকে মাথায় তেল দিচ্ছে

না, চিরুনি লাগাচ্ছে না, গায়ে ময়লা জামা, পরনের শাড়িটাও ময়লা, চোখে কাজল নেই, পায়ে আলতা নেই।

মনে একটু কষ্ট হল ঢেমনার। 'হুঁ, কি বলছিস শুনি?' কুন্তির চোখ দুটো দেখল ঢেমনা।

'বাবু আমায় কী বলল জানিস?'

'কী বলল?'

'কলকাতা থেকে নতুন খাট জাজিম আসছে, টেবিল চেয়ার আলনা সব আসছে।'

শুনে ঢেমনা খুব একটা অবাক হল না। এখানে এসে গাঁয়ের ছুতোর দিয়ে চলনসই গোছের কটা আসবাব তৈরী করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বাবুর যদি এখন আবার কলকাতার দোকান থেকে নতুন দামী আসবাব কিনে আনার ঝোঁক চাপে, তো কিছু বলার নেই। পয়সা আছে, সব কিছুই সাজে তার।

'তা আসুক না নতুন খাট জাজিম—তাতে আমার কি?' একটু চুপ করে থেকে আরো দুখানা কাঠ কেটে ফেলল ঢেমনা, তারপর কুন্তির দিকে চোখ তুলল। 'তোর জন্যও খাট-টাট আসবে নাকি, টেবিল চেয়ার আলনা?'

ফ্যাল ফ্যাল করে কুন্তি ঢেমনার মুখটা দেখল। তারপর আস্তে মাথা নাড়ল। 'আমার কথা কিছু বলেনি—আমার সঙ্গে দুদিন ধরে কথাই বলছে না একরকম। কাল বিকেলে বলল, ঢেমনাকে দিয়ে বড় ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে রাখবি, পুরনো খাট টেবিল চেয়ার সব বের করতে হবে—কলকাতা থেকে নতুন খাট জাজিম টেবিল সব আসছে।'

'আমায় কিছু বলেনি।' চোয়াল দুটো শক্ত করে ফেলল ঢেমনা। 'আমায় কিছু বলেনি, কাজেই ওসব নাড়াচাড়া করতে পারব না।'

'আমায় বলেছে তোকে বলতে।'

'বলুক গে।' থুথু ফেলল ঢেমনা। তারপর আবার কখানা কাঠ

কেটে চেলা করল। তারপর আবার কুন্তির চোখ দুটো দেখল। 'আমার আর এখানে থাকার ইচ্ছে নেই, চাকরি ছেড়ে দেব।'

'কেন।' কুন্তি একটা ঢোক গিলল।

'ইচ্ছে করে না, তার আবার কেন কি—ভাল লাগে না।'

'মাইনে-পত্তর বুঝি ঠিকমত পাচ্ছিস না?'

ঢেমনা চুপ করে রইল। যেন কালো চোখ দুটোর ভিতর আজ একটা উদ্বেগের ছায়া দেখল সে। যেন ঢেমনার জন্য ছুঁড়ির মায়া হচ্ছে। তাই কি?

মুখটা শক্ত করে রেখে ঢেমনা মাথা নাড়ল। 'মাইনে-পত্তর পাব না কেন—ওটা ঠিকই পেয়ে যাচ্ছি—আসলে এই পাপের মধ্যে বাস করতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন, পাপ কেন?' একটু অবাক হতে গিয়েছিল লখিন্দরের মেয়ে। তখনি মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যেন কী একটা কথা ভাবল। অন্যদিকে চোখটা ফিরিয়ে নিল।

'এই পাপের মাঝখানে থাকতে গা ঘিনঘিন করছে।' ঢেমনা আর একবার গলা বাড়িয়ে থুথু ফেলল।

কুন্তি এদিকে চোখ ঘোরাল।

'তুই কি আমাকে খোঁচা দিয়ে কথাটা বলছিস?'

ঢেমনা উত্তর না দিয়ে কাঠ কাটায় মন দিল।

'তাই তো বলি', যেন এবার কুন্তি নিজে কথা বলতে লাগল, 'আমি এখানে আছি, তোর একেবারে সহ্য হচ্ছে না। হিংসেয় ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে।'

'আমার কি, আমার কিছু যায় আসে না।' ঢেমনা চোখ না তুলে পারল না। 'তুই নিজের পায়ে কুড়ুল মারছিস, নিজের সর্বনাশ নিজে করছিস।'

'বেশ করছি।' ফ্যাকাশে মুখ শক্ত করে ফেলে দুই চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক তুলল কুন্তি। 'তোর বুক পুড়ছে কেন, চাকর

চাকরের মতন মুখ বুজে কাজ করে যাবি, তোর এসব দিকে চোখ দেবার কথা না।'

ঢেমনা বুঝল সাপের তেজ একটুও কমেনি, ওদিক ছুঁয়ে কথা বললেই ফোঁস করে উঠছে। চুপ থেকে মাথা গুঁজে সে কাঠ কোপাতে লাগল।

কুন্তি চুপ করে থাকল না, যেন আর একবার নিজে নিজে কথা বলতে লাগল।

'বাবু আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলছে না, কারণ কি, না ঢেমনা রাগারাগি করে, বিরক্ত হয়। বললাম, চাকর—তার রাগারাগিতে কী এসে যায়।'

'তাই তো,' এবার ঢেমনা না হেসে পারল না। 'তাতে বাবু কী বলল?'

'কী আবার বলবে, আমিই বললাম, ওটাকে মেরে তাড়িয়ে দিন, ভাত কাপড় আছে, তার ওপর মাসে মাসে মাইনে দিয়ে এমন শত্তুর পুষে লাভ কি, আমার জন্যে যদি ওর চোখ টাটায়—'

'কী বলল বাবু?' তেতো মতন একটা ঢোক গিলল ঢেমনা, তা হলেও সব কটা দাঁত ছড়িয়ে মুখের হাসিটা ধরে রাখল।

নাকের ডগা কুঁচকে কুন্তি অন্যদিকে চোখটা সরিয়ে নিল। যেন ঢেমনার হাসিটা তার সহ্য হচ্ছিল না।

'কী বলল বাবু?' ঢেমনা আবার বলল, 'আমায় মেরে তাড়িয়ে দেবে?'

'দেয় কি না দেয় দেখবি। আমায় নিয়ে বাবুর সঙ্গে খোঁচাখুঁচি— মজা টের পাবি।' কুন্তি আর দাঁড়ায় না। হাঁটতে থাকে।

'এই শোন্!' ঢেমনা ডাকল।

কুন্তি শুনল না।

'আমার মনে হয় এখান থেকে তোর চলে যাওয়া ভাল।' গলা বড় করে ঢেমনা বলল, 'এই পাপপুরী ছেড়ে না গেলে তোকে একদিন

আর চেনাই যাবে না, খুঁজে পাওয়া মুসকিল হবে। এখনই তো প্রায় চেনা যাচ্ছে না।'

ঘাড় ঘুরিয়ে কুন্তি রুখে দাঁড়াল। চোখমুখের এমন অবস্থা করল, যেন ঢেমনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নখ দিয়ে তাকে আঁচড়ে দেয়, কামড়ে দেয়। ঢেমনা অবশ্য তার রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে ভয় পেল না। আবার কাঠ কাটায় মন দিল।

'চেনা যাচ্ছে না কেন, আমি কী হয়ে গেছি?' কুন্তি চিৎকার করে উঠল।

'তুই যা ছিলি যেমন ছিলি, এমন আর তা নেই—' মুখটা তুলে ঢেমনা গম্ভীর গলায় উত্তর করল।

'আমি কি ছিলাম শুনি?'

'বিলের ধারে ছুটোছুটি করে জাল রং করতিস, জাল শুকোতে দিতিস। পচা মাছের পেট গালিয়ে বাঁসের আগায় গেঁথে সেই মাছ রোদে শুকিয়ে শুঁটকি করতিস, তারপর সব কাজ শেষ হয়ে গেলে দশটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে হৈ হৈ করে বিলের জলে সাঁতার কাটতিস।'

'ঐ জীবনটা বুঝি আমার ভাল ছিল?'

'আমি তো তাই মনে করি।'

'তুই তাই মনে করবি - গায়ে মাছের গন্ধ, শামুক গুগলি পানার গন্ধ, হাতে পায়ে গাবের কষ, পরনে ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড়—তোর চোখে ঐ ভাল ছিল।'

একটু দম নিয়ে লখিন্দরের মেয়ে বলল, 'এখানে ফর্সা জামাকাপড় পরছি, গা হাত পরিষ্কার রাখছি—দেখে তোর সহ্য হচ্ছে না, জেলের মেয়ে, আবার কেন জলকাদায় গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছি না—এই নিয়ে অষ্টপহর তোর মাথার যন্ত্রণা, বুকের যন্ত্রণা।'

'জলকাদাই তোকে বাঁচিয়ে রাখত।'

'আমি বাঁচি কি মরি—সে আমি দেখব। চাকরের কথা শুনে আমি নাচব না।'

কুন্তি আর দাঁড়াল না। দাঁতে দাঁত ঘষে ঢেমনা চুপ করে থাকল। ভিতরে বিষ ঢুকেছে ছুঁড়ির, এই বিষ সহজে ছাড়ানো যাবে না, ভাবল সে। ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কথাটা ঠিকই। পরদিনই লরী বোঝাই হয়ে কলকাতা থেকে নতুন খাট টেবিল চেয়ার আয়না আলমারী এসে গেল। কত ভাল কাঠ, কেমন চমৎকার পালিশ সব আসবাবের। যেন আয়না, মুখ দেখা যায়।

উহুঁ, ঢেমনাকে কিছুই করতে হল না।

কলকাতা থেকে মিস্ত্রী এসেছে, দুটো কুলী এসেছিল সঙ্গে। তারাই টেনেটুনে ধরাধরি করে ঘরের পুরনো জিনিসপত্র বের করে ফেলল, তারপর নতুন আসবাব দিয়ে ঘর সাজাল। সত্যি, তাকিয়ে দেখার মতন একটা খাট, দুটো মানুষের হাত পা ছড়িয়ে শোবার মতন খাট, টেবিলটাও দেখবার মতন, কতবড় একটা আরশি টেবিলের সঙ্গে। সামনে দাঁড়ালে একটা মানুষের পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত দেখা যায়।

একটু পরেই আর একটা লরী বোঝাই হয়ে সোফা সেট্ আরামকেদারা ডাইনিং টেবিল কার্পেট পাপোষ পর্দা আরো সব কী কী যেন এসে গেল। হুঁ, সেই সঙ্গে জাজিম তোষক লেপ বালিশ মশারী। সব নতুন। এবং সব যেন দামী জিনিস।

ব্যাপার কি। তা হলে তো একটা মতলব বাবুর মাথায় আছে ঠিকই। ঢেমনাকে যেমন কিছু বলছে না, তেমনি কুন্তিকেও কিছু বলছে না।

নতুন জিনিসপত্র দিয়ে শোবার ঘরখানা মনের মতন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে বাবু আবার কলকাতা ছুটে গেল।

সেই ফাঁকে কুন্তি একবার এঘরে ঢুকে ঘুরে ঘুরে সব দেখল। আরশি-বসানো টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ ও শরীরটা দেখল। জানালার কাছে গিয়ে চমৎকার নক্সা করা পর্দাগুলি দেখল। ঘরের মেঝেয় কার্পেট বিছানো হয়েছে, তার ওপর দিয়ে কুন্তি একটু হাঁটল। একটা জানালার নিচে সোফা বসানো হয়েছে। সোফার উপর ছু'হাঁটু একত্র করে একটু সময় বসল।

এমন সময় ঢেমনা এসে দরজায় উঁকি দিল।

'কি দেখছিস?'

কুন্তি ফ্যালফ্যাল করে ঢেমনাকে এক নজর দেখল, তারপর ঘাড় গুঁজে চুপ করে রইল।

ছুঁড়ি সত্যি মনমরা হয়ে আছে। ঢেমনার কথায় মাঝে মাঝে ফোঁস করছে ঠিকই, আবার যেন কেমন মিইয়ে পড়ছে।

'তোকে কি কিছুই বলছে না?' ঢেমনা আরো কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

কুন্তি মাথা নাড়ল।

'তোকে কিছু বলছে না?' কুন্তি পাল্টা প্রশ্ন করল।

'নাঃ।' ঢেমনা মাথা নাড়ল।

তারপর ছুজনেই চুপ করে থেকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের জিনিসগুলি দেখতে লাগল।

'নতুন কাপ ডিশ এসেছে, দেখছিস?'

কুন্তি ঘাড় নাড়ল। তারপর আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আর ওই ছাখ তাকের ওপর রুপোর থালা গেলাস বাটি।'

'উহুঁ রুপোর না।' তাকের বাসনগুলি একনজর দেখে ঢেমনা তখন হাসল। 'এসব হল স্টেনলেস স্টীলের বাসন। আজকাল কলকাতার বাবুরা খুব ব্যবহার করেছে।'

কুন্তি বলল, 'টেবিলে ফুলদানী, ফুল সবই এসে গেছে।'

ঢেমনা বলল, 'নতুন সাবানের বাক্স, মাথার তেল পাউডারের ডিবি আয়না চিরুনি আলতা দেখতে পাচ্ছিস?'

কুন্তি ঘাড় কাত করল।

'আমার মনে হয় তোর জন্যেই সব আসছে।' আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন ঢেমনা কথা বলল।

কুন্তি ঠোঁট ওল্টাল।

'ধেৎ। তা হলে বাবু আমায় কাছে ডাকত, বলত, সব পছন্দ হয়েছে কিনা ছাখ্।'

'ডাকবে, পরে ডাকবে, এখন আমার ওপর রেগে গিয়ে চুপ করে আছে, আমার ওপর শোধ তুলবে বলেই তোকে নতুন করে—আরো পাকাপোক্ত করে এই সংসারে বসাবে, দেখছিস না, ডবল খাটের বিছানা এসেছে, মেয়েমানুষের মাথার চিরুনি আলতা তেল সব এসে গেছে।' যেন ভিতরে জ্বালা নিয়ে ঢেমনা হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

তাই কি? উৎসাহে আশায় লখিন্দরের মেয়ের চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'না না, তুই বাবুর মন বিষিয়ে দিয়েছিস। তুই যেমন করে বলেছিস, পাঁচটা জেলের সঙ্গে কেলেঙ্কারি করে, হুঁ, সব কটা ছোঁড়ার মাথা চিবিয়ে খেয়ে শেষ করে তারপর এখানে এসে বাবুর মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছি—কাজেই বুঝতে পারছিস, তারপর বাবু আর আমাকে এ সংসারে আমল দেয় কখনো? মনে হয় না। বলছিল, একটা চাকরের মুখে এতসব অপমানের কথা তোর জন্যে শুনতে হল।'

আকাশ থেকে পড়ল ঢেমনা। হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ছুঁড়ির মুখটা দেখল একটু সময়। তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। শয়তান ঠিক এভাবেই তো কথাটা তুলবে, নিজের দোষ ঢাকতে। অর্থাৎ ঢেমনা সেদিন রাত্রে যেমন বলেছিল, একটা গাঁয়ের মেয়েকে নষ্ট করেছে নিমাই। সরল মেয়ে, তাই দুটো শাড়ি জামা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার জীবন

ধ্বংস করেছে—উহুঁ, জেলের মেয়েটাকে সেসব শোনাতে যাবে কেন দুষ্ট, বরং উল্টো করে সব কথা বলবে। বলেছে। হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে উঠল ঢেমনার।

'তুই আমার দিকে তাকা কুন্তি।' ঢেমনা গাঢ় গলায় ডাকল।

'বল্ শুনছি।' কুন্তি চোখ তুলল না। মাটির দিকে চেয়ে রইল।

'সে হল আসল শয়তান, আমি চিনি তাকে, অনেক দুষ্কর্ম করে বেড়ায় কলকাতা শহরে, এখন গাঁয়ে এসে বিষ ছড়াচ্ছে, আমি তাকে বলেছি সেদিন, তুই একটা নিরীহ কুমারী মেয়ের জীবন নষ্ট করতে উঠে পড়ে লেগেছিস, অত্যন্ত অন্যায় করেছিস এটা, এ জিনিস বন্ধ কর, এ পাপ সহ্য হবে না।'

দুহাতে মুখ ঢেকে কুন্তি চুপ করে রইল।

'কাজেই আমার ওপর শয়তানের রাগ,' একটু চুপ করে ঢেমনা আবার বলল, 'আমাকে তুই বিশ্বাস কর - ঠিক এই কথাই তোর বাবুকে সেদিন বলেছি, আর দুষ্ট তোকে এখন বলছে অন্য রকম, বলবেই। নিজে সাধু সেজে থাকছে—এদিকে আমার ওপর তোর বিদ্বেষটা আরো বেড়ে যাবে - বুঝলি না? এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল।'

কুন্তি এবার কথা বলল না।

'কাজেই তোকে বার বার বলছি, আগেও বলেছি, এখান থেকে তুই সরে যা—এই পাপপুরী থেকে পালিয়ে যা। তার মতলব ভাল না।' ঢেমনা একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল। 'নতুন করে এত সব জিনিসপত্তর কেন আমদানী করা হচ্ছে ঈশ্বর জানে।' যেন শেষের কথাটা ঢেমনা নিজের মনে বলল।

'তুই সত্য কথা বলেছিস কি বাবু সত্য কথা বলেছে, আমি কেমন করে বুঝব।' মুখ থেকে হাত সরিয়ে কুন্তিও একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর চোখ ঘুরিয়ে আবার নতুন খাট টেবিল আলনা আলমারী সব দেখতে লাগল।

তাই বলো! সন্দেহ দূর হচ্ছে না লখিন্দরের মেয়ের, বিশ্বাস দানা বাঁধছে না। ছুঁড়ির মনের ভাব বুঝতে পারল ঢেমনা। নতুন খাট বিছানা তেল আলতার শিশি তাকে হাতছানি দিচ্ছে—ঢেমনা মনে মনে হাসল অথচ বুক ফেটে যাচ্ছিল তার দুঃখে রাগে অপমানে আক্রোশে। মুখে সে তার কিছু বলল না। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখা যাক, ভাবল সে তখন, যদি এতসব তোর জন্যই আনা হয়ে থাকে, তোকে বাবু আবার নতুন করে এ ঘরে ডাকে, তবু বোঝা যাবে একটা লোকের কাছে দুষ্ট খাঁটি সত্য আছে। কিন্তু তাই বা কতটা সত্য হবে কে বলবে, বাতাসের আগে শয়তানের মন নড়াচড়া করে। ঝোপ বুঝে কোপ বসাতে তার মতন ওস্তাদ এই দুনিয়ায় আর কেউ আছে নাকি!

পরদিন দুপুরে ঢেমনা আবার চাঁপাডাঙ্গার হাটে ছুটল। আজ আর শুধু তেলের টিন হাতে না, ঘিয়ের ভাণ্ড এবং বড় বেতের ধামাও সঙ্গে নিয়েছে। ঘি গরমমশলা পেঁয়াজ রসুন বড় সাইজের নৈনিতাল আলু, মাংস, যদি গলদা চিংড়ি পাওয়া যায় তো গলদা চিংড়ি এবং টুকিটাকি আরো অনেক কিছু—এতবড় ফর্দ নিয়ে ঢেমনা হাটে চলেছে।

বাবু আজ সকালে নিজের হাতে ফর্দ তৈরি করে দিয়েছে। ভাল দৈ মিষ্টি গাঁয়ের হাটে পাওয়া যায় না। বাবু কলকাতা থেকে সেসব নিয়ে আসবে। ফর্দ তৈরি করে দিয়েই মোটর বাইক ছুটিয়ে বাবু কলকাতা চলে গেছে। বিকাল নাগাদ ফিরবে, সঙ্গে একজন আসবে।

রাত্রে খাবে। কাজেই সেভাবে রান্নাবান্না হবে। কি কি রাঁধতে হবে তা-ও বাবু বলে গেছে। মাংস হবে, ছোলার ডাল হবে, বেগুন ভাজা পটল ভাজা, গলদা চিংড়ির মালাই-কারী আর নয়তো পাকা রুই বা কাতল এনে মাছের কালিয়া এবং চাটনি। তবে ভাত রান্না হবে না। যে মানুষ সঙ্গে আসছে রাত্রে তার ভাত চলে না। ময়দা খায়। কাজেই পরটা হবে। আজ কলকাতা থেকে আসার সময় বাবু ভাল ঘি সঙ্গে নিয়ে আসবে। আজকের মতন হাটের ঘি দিয়েই কাজ চালাতে হবে। কেননা, যদি কোনো কারণে বাড়ি এসে পৌঁছাতে তাঁদের রাত হয়ে যায় তো তখন পরটা ভেজে দিতে গেলে খাওয়ার দেরি হয়ে যাবে। অসময় হয়ে যাবে। বাবুর তেমন কিছু অসুবিধা হত না, কিন্তু যে আসছে তার অসুবিধা হবে।

তাই তো, কে আসছে, যেন খুবই একটা মান্যগণ্য উঁচুদরের মানুষ, একেবারে নেমন্তন্নের মতন খাওয়া দাওয়ার আয়োজন, অথবা খুবই যেন পেয়ারের মানুষ, বন্ধুটন্ধু হবে কেউ। ঢেমনা চিন্তা করল। এখন হাটে যাবার সময় রাস্তায় নতুন করে কথাটা ভাবছিল সে এই জন্য, যিনি সঙ্গে আসছেন তিনি যেন ঠিক একরাত কি একদিন থাকবার জন্য আসছেন না। দু চারদিন থাকবেন। বেশিও থাকতে পারেন। পনেরো দিন কি একমাস—নাকি আরো বেশি, বোঝা যাচ্ছে না। ঐ যে কলকাতা থেকে ঘি আসছে, রাত্রে রুটি পরটা খাবেন, আজ রাতটা এখানকার ঘি দিয়েই কাজ চালাতে হবে। এ থেকেই ঢেমনা ধরে ফেলেছে, বেশ কদিনের জন্যই তিনি আসছেন।

আসুন ক্ষতি নাই। তারটা কিছু খাবে না, তার ঘরে শোবে না। ঢেমনার বাড়ি না এটা যে, অতিরিক্ত একটা মানুষ এসে থাকছে বলে সে প্যানপ্যান ভ্যানভ্যান করবে, বিরক্ত হবে।

তবে প্যানপ্যান করার, বিরক্ত বোধ করার সূচনা দেখা যাচ্ছে। অতিরিক্ত একটা মানুষ এসে থাকতে আরম্ভ করলে কাজকর্মও বেড়ে যাবে। দু পদ বেশি রাঁধতে হবে, স্নানের জল তুলে রাখতে হবে,

মুখ ধোবার জল তুলে রাখতে হবে, তারপর কাপড়টা কেচে গামছাটা ধুয়ে দেওয়া—উঁহু, একলা হাতে এত কাজ, এত খাটনি ঢেমনার পোষাবে না। টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে। দুদিন দেখবে ঢেমনা—যদি বোঝে মানুষটা এখানে থেকেই যাচ্ছে তখন ঢেমনা বাবুর কাছে তার মাইনে বাড়াবার কথাটা তুলবেই, তুলতেই হবে। এসব ব্যাপারে চুপ থাকলে চলবে না।

চুপ করে থাকলে চাকরবাকরের ঘাড়ের ওপর বাবুরা পা রাখতে চায়। এখন আর সেদিন নেই। এই তো কলকাতা শহরে রাত দিন লালঝাণ্ডার মিছিল বেরোয়, মাইনে বাড়াও, দাবি মেটাও, কথায় কথায় মিছিল, কথায় কথায় সভা। না হলেই কাজ বন্ধ, ঘেরাও—সুবিধা না পেলে কত্তাদের ধরে ধরে ধোলাই দেওয়া।

'হেই দাদা—'

ঢেমনা চমকে উঠল। কেউ ডাকছে। দু পাশে ধান ক্ষেত, পাট ক্ষেত, মাথার ওপর আশ্বিনের দুপুরের গনগনে রোদ নিয়ে আকাশটা যেন গরম কড়াই হয়ে আছে। একটা গরুর গাড়ি দেখা যায় না, গরুটা ছাগলটাও চোখে পড়ছে না, মানুষ তো নয়ই, শূন্য ভুবন খাঁ খাঁ করছে। এই অবস্থায় হঠাৎ কেউ ডাকছে শুনলে গা ছমছম করে ওঠে।

তবে ঢেমনা সাহসী ছেলে, হুট করে কোনো কিছুতে ঘাবড়ে যাওয়া তার ধাতে নেই। শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। বুঝল সেদিনের সেই ছাতিমগাছটার কাছে এসে গেছে। এখানেই মদন ছোঁড়া তাকে শাসিয়েছিল। জায়গাটা চিনতে তার কষ্ট হল না। তাছাড়া দু'দিন চারদিন পরপরই তো গাঁয়ের এই বাঁধানো সড়ক ধরে সে চাঁপাডাঙার হাটে নয়তো নীলগঞ্জের হাটে কি আরো দূরে যেতে হলে কমলপুরের হাটে ছুটছে। বাবুর খাওয়ার তো কিছু কমতি নেই, পয়সা আছে, কাজেই জিভটাও এত বড়—রোজই মাছটা চাই, ডিমটা চাই। একদিন বাদ গেল তো পরদিনই আবার মুর্গী। ডাল

তরকারি একেবারে রোচে না, কাজেই ঢেমনার হয়রানি। ছুটে ছুটে যাওয়া।

এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ঢেমনা ছাতিমগাছটার দিকে এগোতে লাগল। রোদের ঝাপটায় প্রথমটায় গাছতলার ছায়ায় কালো কালো মানুষগুলিকে সে ভাল দেখতে পায়নি। এখন দেখতে পেল। কারণ ওই ছায়ার দিকে চোখটা রেখেই সে এগোচ্ছিল। গাছের গুঁড়ির কাছে ছড়ানো শিকড়ের ওপর উবু হয়ে চার পাঁচজন বসে আছে, না আরো বেশি, আট-দশজন। কেমন যেন বাঁদরের সভা বসে গেছে ওখানটায়। ব্যাপার কি?

'আমায় ডাকছেন?' তিন চার হাত দূরে থাকতে ঢেমনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ গো দাদা, হ্যাঁ তোমার জন্যই তো পথ চেয়ে বসে আছি সব। আজ হাটবার, চাঁপাডাঙ্গার হাটে যাবে তুমি—' দুজন হি হি করে হেসে উঠল।

মদনও রয়েছে। ঢেমনা চিনতে পারল। আর কারো মুখ সে চেনে না। সবাই এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছে। উদোম গা। হাঁটুর ওপর গামছার মতন ছোট ছোট কাপড় পরনে। পায়ে কাদা, গায়ে ছিটে ছিটে শুকনো কাদার দাগ। যেন জলকাদা ঘাঁটছিল তারা কতক্ষণ আগে। এখন কাদা শুকিয়ে সাদা রং ধরেছে। নাকের নিচে ভোমর পাখার মতন কালো ফিনফিনে গোঁফ, ছড়ানো বুকের ছাতি, কাঁধের মাংস গুলি বাঁধতে আরম্ভ করেছে। হুঁ, ঢেমনা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, জোয়ান তাগড়া ছেলে, মদনের বয়সী সব।

'আমায় কিছু বলবে ভাই তোমরা?'

'হুঁ', এক সঙ্গে পাঁচটা গলা হেঁকে উঠল। 'বলব বলেই তো তীর্থের কাকের মতন সব বসে আছি।'

'বলো।' ঢেমনা শুকনো ঢোক গিলল। কাঁধের গামছা দিয়ে

কপালের ঘামটা মুছল। 'বলো ভাই কী বলার আছে, বলে ফেল, আমার ফিরে গিয়ে রান্নাবান্না আছে, বাড়িতে অতিথি আসবে।'

'রাখো তোমার অতিথ্।' সেই ছেলে, যার নাম মদন, চোখ লাল করে উঠল। 'খুব দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'আহা, বলো না, আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।' ঢেমনা চটল না। ঘিয়ের ভাণ্ড ও বেতের ধামাধা মাটিতে নামিয়ে রাখল। আবার কাঁধের গামছা দিয়ে বেশ করে গলাটা মুছল, ঘাড় মুছল। 'কি হল চুপ করে আছ সব?'

একবার এক সঙ্গে সবাই হেঁকে উঠে আবার চুপ করে আছে। চুপ করে থেকে একজন আর একজনের মুখ দেখছে। যেন তার পর কী বলার আছে তারা বুঝতে পারছে না।

'এই পরাশর, তুই বল্ না।' কালো চেহারার একটা ছেলে মদনের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। বড় ভাসা ভাসা চোখ। কোঁকড়ান চুল মাথায়। বাঁশির মতন চমৎকার একখানা নাক। মদন ঘুরে দাঁড়িয়ে তার কনুই ধরে ঝাঁকুনি দিল। 'তোর জিনিস, তুইই তো বলবি, ইনিকে বল্ কী বলবি, ইনির মনিবই তো তোর কুন্তিকে আটকে রেখেছে।'

ছেলেটি কিন্তু চোখ তুলে ঢেমনার দিকে তাকাতে পারল না। কেমন যেন একটা লাজুক হাসি ঠোঁটে লুকিয়ে পায়ের নিচের মাটি দেখতে লাগল।

এই মুখচোরা ছোঁড়াই তা হলে সেই পরাশর। ঢেমনা ভাল করে চেহারাটা দেখল। হুঁ, লখিন্দরের মেয়েকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসে, লখিন্দরের মেয়ে নাকি সে-খবর জানে না। লুকিয়ে ছোঁড়া কুন্তির মুখের ছবি আঁকে। এই অবধি ক'শো ছবি আঁকল কে জানে।

'বল্ না কী বলবি।' আর একটি ছেলে পরাশরের কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। 'দাদাকে সুবিধেমত যখন পাওয়া গেছে তখন ব্যাপারটা আজই আমরা পরিষ্কার করে ফেলতে চাই।'

ভাসা ভাসা চোখ দুটো তুলে পরাশর একবার সরাসরি ঢেমনার মুখের দিকে তাকাল। একটা ঢোক গিলে বলল, 'দাদা, তোমার বাবুর কাজটা কি ঠিক হচ্ছে, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, আমাদের খেলার সাথী, আজ কিনা সেই মেয়েকে আমরা চোখের দেখাটাও দেখতে পাই না।'

'তা যা বলেছ ভাই কথাটা ঠিকই।' সুরটা নরম করে ঢেমনা বলল, 'লখিন্দরের মেয়ে এখন বলতে গেলে চব্বিশঘণ্টাই ওবাড়ি আছে। জিনিসটা আমার চোখেও ভাল ঠেকছে না। তবে কিনা শুনছি, ওর বাবা যেমন বলে দিয়েছে তাই করছে। মেয়ে বাবুর ঘরদোর গুছোয়—সময়মত বাবুকে খেতে দেওয়া, বিছানা করে দেওয়া, স্নানের জল এগিয়ে দেওয়া, বাবুর জামা কাপড় ঠিক করে রাখা—সবই প্রায় তাকে দেখতে শুনতে—'

'রাখো দাদা রাখো—' একটু বেশি বয়স ছোঁড়ার, থ্যাবড়া নাক, কপালে একটা মস্ত কাটা দাগ, মাথায় বাবড়ি, সকলের পিছনে ছাতিম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, কথাবার্তা শুনছিল, এবার লাফ দিয়ে ঢেমনার সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমার সঙ্গে বোধ করি দাদার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, আমার নাম নটবর—হুঁ কথা হচ্ছে কি, ওই যে বললে, বাবুর বিছানা করে দেওয়া, চানের জল, মুখ ধোবার জল এগিয়ে দেওয়া, জামাকাপড় ঠিক করে রাখা—ব্যাপার ঠিক সেখানেই থেমে থাকে নি, ব্যাপার আরো অনেক দূর গড়িয়েছে—আমরা সব জানি, আমরা সব জেনে গেছি। জল এর মধ্যেই বেশ ঘোলা হয়ে গেছে—একটা পাঁড় মাতাল তোমার বাবুটি, আর সেই মাতালের খপ্পরে পড়েছে আমাদের কুন্তি—'

'দেখ ভাই, আমি হলাম গিয়ে একটা চাকর—বাজার হাট করি, কাঠ কাটি জল তুলি, রান্না নামাই—আমি তো মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না—আমি দু-কথা বললে বাবু আমায় তাড়িয়ে দবে, তখন আর এক জায়গায় আমাকে চাকরি খুঁজতে হবে, তা-ও কতদিনে চাকরি খুঁজে পাব তার ঠিক কি, তোমরা বরং লখিন্দরকে যদি বুঝিয়ে বলো,

সোমত্ত একটা মেয়েকে ওখানে রাখা ঠিক হচ্ছে না, তবে বুঝি কাজ হয়—'

'না না, লখিন্দরকে অনেক বোঝানো হয়েছে, ও শালা বিষয় আসয় টাকাকড়ি ছাড়া আর কিছু চেনে না। আমাদের কথা কানেই তোলেনা। আমরা ঠিক করেছি লখিন্দরকে এক ঘরে করব—'

'হুঁ, তাই কর।' ঢেমনা খুশী হয়ে ঘাড় কাত করল। ঘিয়ের ভাণ্ড ও বেতের ধামাটা হাতে তুলে নিল।

'উঁহু, কেবল ওই বলে তোমার কেটে পড়লে চলবে না।' মদন গলা চড়িয়ে দিল। 'তুমি সেদিন তোমার বাবুর হয়ে খুব ঝগড়া করে গেছ। বলছিলে একটা মস্ত সাধু পুরুষ তোমার বাবু, সাধু কি একটা লম্পট সে আমরা বুঝে গেছি—আমাদের আর বুঝিও না, তা যাক গে, তোমার বাবু তোমার থাক—এখন কথা হচ্ছে, তুমি আমাদের কুন্তিকে ওখান থেকে বের করার ব্যবস্থা কর তো—'

'আমার কথা কি ও শুনবে!' ঢেমনা প্রথমে মদন, তারপর বাকি সকলের মুখের দিকে বেশ একটু করুণ চোখে তাকাল।

'শুনবে, আলবৎ শুনবে।' সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমি বুঝিয়ে বলবে, বলবে যে পরাশর মদন নটবর, সবাই তোমার ওপর ক্ষেপে গেছে, ভাল চাও তো এই বাড়ি ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে যাও।'

'আমি কিন্তু ভাই তোমার কথা শুনে সেদিন গিয়ে ওকে বুঝিয়েছিলাম,' মদনের দিকে চোখ ফিরিয়ে ঢেমনা অল্প হাসল, 'গাঁয়ের লোক নিন্দা করছে—তোমার বয়সটা কম, কুমারী মেয়েছেলে, একটা আইবুড়ো বাবুর ঘরে রাতদিন এভাবে থাকাটা ঠিক না—'

'তখন কুন্তি কী বলল?' এবার পরাশর গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল।

'ঐ এক কথা, বাবার কথায় এখানে এসেছি।'

'বাবার কথায় এসেছি?' চোখ লাল করে নটবর বলল, 'বুড়োকে

'আমরা শীগগিরই জব্দ করছি, ভালরকম শিক্ষা দিচ্ছি। একঘরে হয়ে থাকবে সে, মেয়েকে তুমি ভাই কথাটা জানিয়ে দিও।'

'আর গাঁয়ের লোকের কথা বলবে না, গাঁয়ের মানুষ নিন্দা করছে বলে কিছু লাভ হবে না, বলবে গাঁয়ের ছেলেরা—আমি মদন নটবর রাম্ সুধন্য—আমরা সব একজোট হয়েছি—আমরা ভয়ানক রেগে গেছি তার ব্যবহারে, আমরা কোনোদিন আশা করিনি যে একটা লোক, আমাদের চোখে প্রায় বিদেশী, কলকাতার মানুষ, পয়সা আছে বলে লখিন্দরের মেয়ে তার পায়ে কামড় খেয়ে পড়ে থাকবে, আমাদের কথা একবারও মনে পড়ছে না।' একলা পরাশর কথাগুলি বলল। বলতে বলতে তার গলাটা কেমন যেন ভেঙে গেল।

কোমর থেকে গামছা খুলে গামছার খুঁট দিয়ে চোখের কোণা মুছল পরাশর।

সব একসঙ্গে চুপ করে রইল।

একটা দমকা বাতাস ছাড়ল একটু সময়ের জন্য। মাথার ওপর ছাতিম গাছের পাতার ঝরঝর শব্দ শোনা গেল। রাস্তার কিছু ধুলোবালি উড়ল। তারপর আবার সব থেমে গেল।

'শোন ভাই', নটবর বলল, 'ওভাবে ছুঁড়িকে বুঝিয়ে কাজ হবে না। তুমি এখনই হাট সেরে বাড়ি ফিরে গিয়ে তাকে বলবে, আজ শুক্রবার, কাল শনিবার রাত হবার আগেই ওবাড়ি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হবে। যদি না আসে তো আমরা দশটা জোয়ান ছেলে দা সড়কি লাঠি হাতবোমা সব নিয়ে গিয়ে ওবাড়ি হামলা করব, গিয়ে হিড়হিড় করে কুন্তিকে ঘর থেকে টেনে বার করব, যদি কেউ বাধা দেয়—তো বুঝতেই পারছ, রক্ষা পাবে না, ধড় থেকে মুণ্ডটা কেটে আলগা করে তুবে নিয়ে আসব—বোমা মেরে ঘরবাড়ি উড়িয়ে দেব—আমরা জেলের ছেলে, কৈবর্তের ছেলে, পাপ করি না, পাপ দেখলে তা সহ্যও করি না।'

'আর আমরা ক্ষেপে গেলে স্বয়ং ব্রহ্মাও আমাদের রুখতে পারবে না, এই কথাটাও দাদাকে জানিয়ে রাখলাম।' গলার রগ ফুলিয়ে মদন ঢেমনাকে কথাটা শুনিয়ে দিল।

'ঠিক আছে, আমি বলব, আমি এখনি যেয়ে লখিন্দরের মেয়েকে জানিয়ে দেব।' ঢেমনার শরীর নড়ে উঠল, যেন হাঁটবার জন্য এক পা বাড়িয়েও দিল।

'আর শোনো, তোমার কোনো ভয় নেই, তোমাকে যখন আমরা দাদা বলে ডেকেছি—আমরা ভাবব তুমি আমাদের সাহায্যই করছ।'

'না না, আমি ভয় করব কেন—আমি এখানে কেউ না, চাকর—বরং তোমাদের কুন্তিকে আমি একদিন বলেছিলাম, লোকে নিন্দা করছে।' এক সেকেণ্ড থেমে থেকে যেন একটু ভয়ও পেয়েছে, চোখমুখের এমন একটা ভঙ্গি করে ঢেমনা অযথা হাসল তারপর কি যেন চিন্তা করে পরে বলল, 'বাবুকে আর কিছু বলব না তাহলে?'

'উঁহু, কিছু বলতে হবে না ওই বদমাসকে, বললে পাল্টা চোখ লাল করবে, থানা পুলিশ দেখাবে—' নটবর একদলা থুথু ফেলল: 'যদি দেখি কুন্তি কালকের মধ্যে বেলাবেলি ওখান থেকে বেরিয়ে না এসেছে তো আমরা সাঁজবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওবাড়ি গিয়ে চড়াও হব—গিয়ে ওই লম্পটের সামনেই লখিন্দরের মেয়েকে ঘর থেকে টেনে বার করব। যদি শালা আমাদের মুখের ওপর একটা কথা বলতে আসে তো মাছ কাটার দা দিয়ে কুপিয়ে শালাকে সেখানে শেষ করব।'

ঢেমনা অন্যদিকে চোখটা সরিয়ে নিল। কেন না নটবর হাত নেড়ে কেমন করে দা দিয়ে কুপিয়ে একটা মানুষকে কাটতে হয়, ঢেমনাকে বোঝাতে চাইছিল।

'বলে কি না থানা পুলিশ, আমরা কৈবর্তের ছেলে, মার পেট থেকে বেরিয়েই রক্ত দেখি, দা দেখি, সড়কি বল্লম কাকে বলে চিনে রাখি—'

'আচ্ছা ভাই', কাকুতির সুরে ঢেমনা বলল, 'এবার আমাকে ছেড়ে দিতে হয়, বেলা আর বড় বেশি নেই, বাজার করে নিয়ে ফিরে গিয়ে আমায় রান্না চাপাতে হবে—অতিথি আসবে বাড়িতে।

তারা আর শব্দ করল না। চুপ করে রইল। ঢেমনা লম্বা পা ফেলে হাটের দিকে ছুটল। 'তাই হবে', মনে মনে সে বলল, যেন নিমাইবাবুকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলল, 'এভাবে যদি তোমার শিক্ষা হয়—শিক্ষা মানে কি, শিক্ষা তোমার কোনোদিনই হবে না, তোমার কপালে অপমৃত্যু লেখা আছে, কলকাতার মেয়েছেলে নিয়ে ঢলাঢলি আমোদফূর্তি না, এখানে সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়েছ। ছোবল খাবেই।'

বেলেবাটার কৃষ্ণচূড়া ফুলগাছওয়ালা চারতলা বাড়িটার ছবি মনে পড়ল ঢেমনার। হুঁ, দোতলার বারান্দায় বুড়ো বসে আছে। বুড়োর ঠাণ্ডা স্থির ঘোলাটে চোখ দুটো দেখতে দেখতে ঢেমনা এক সময় হাটের ভিড়ে মিশে গেল।

তাজ্জব বনে গেল ঢেমনা। আবার সেই অবস্থা মনের। হাসবে কি কাঁদবে সে বুঝতে পারছিল না। বাড়ি ঢুকবার সময় বাগানের মালী ভূষণার মুখে কথাটা শুনল। এই তো, একটু আগে বাবু কলকাতা থেকে ফিরেছে। একলা না, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে। ভূষণার মুখের দিকে হাঁ করে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল ঢেমনা। কেমন দেখতে, কত বয়স? বয়সটা ঠিক মালুম করতে পারছে না ভূষণ। 'তবে কিনা যুবতী মেয়েছেলে, দেখতে শুনতেও মন্দ না। লম্বা চওড়া, টলটলে একজোড়া চোখ, মাথায় চুলটুলও বেশ আছে। বাহারের শাড়ি পরনে। পায়ে জুতো। হাতে কুচকুচে কালো

চামড়ার ব্যাগ।' ভূষণার কলকাতা যাওয়া-আসা আছে। তার মামা সেখানে হোটেলে চাকরি করে। কাজেই ভূষণা সবটা বর্ণনা চোখ বুজে এককথায় সেরে ফেলল, 'মনে হয় যেন একটা কলেজের মেয়েকে ভটভটি গাড়ির পেছনে বসিয়ে এই মাত্তর শহর থেকে ফিরল।'

ঢেমনার মাথায় ধামা ভর্তি সওদা, হাতে ঘিয়ের ভাণ্ড, বলতে গেলে সাঁজবাতি একরকম লেগে গেছে, গাছপালা কালচে রং ধরল, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল, বাগানের পিছনটায় জোনাকী পোকার নড়াচড়া আরম্ভ হয়েছে। হাট থেকে ফেরার সময় খুব একটা ছুটেই আসছিল সে। আশ্বিনের ছোট দিন। কিন্তু দেখতে দেখতে যে অন্ধকার হয়ে যাবে কে জানত। কাজেই এতটা পথ ছুটে আসার দরুন ঢেমনা ঘামছিল। অথচ ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়ছে, পায়ের নিচে ঘাস ভেজা লাগছিল।

কপালে পিঠে চাপ চাপ ঘাম নিয়ে ঢেমনা ভিতরের উঠোনে ঢুকল। উঠোনে পা দিয়েই বাবুর ঘরের দামী জানালার ঝলমলে পর্দা দেখে সে বুঝল, ভূষণা মিছে কথা বলেনি। বাবুর ঘর যেন হাসছে। তা-তো হবেই। আজ আর হ্যারিকেন না, হড় হ্যাজাক বাতিটা জ্বালানো হয়েছে, ভিতরের ঝকমকে সাদা আলোর চেহারা দেখে টের পাওয়া যায়। পর্দার ওপর দিয়ে এতটা আলো এসে পড়ে উঠোনের খানিকটাও ঝলসে দিয়েছে।

সওদা নিয়ে ঢেমনা সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। জায়গাটা অন্ধকার। রান্নাঘরের দরজায় একটা আবছা ছায়া মূর্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঢেমনাকে দেখে নড়েচড়ে উঠল।

'কে?'

'আমি।'

'কুন্তি?'

'হুঁ।'

'এখানে কী করছিস?'

'উনুন ধরিয়ে দিয়েছি। চায়ের জল চাপিয়েছি।'

আকাশ থেকে পড়ল চেমনা। একটু খুশীও যেন হল। কুন্তি উনুন ধরিয়েছে! চায়ের জল চাপিয়েছে! একটা নতুন ঘটনা। এই বাড়ি এসে লখিন্দরের মেয়ে কোন্‌দিন নিজের হাতে চা করেছে!

'বাবু এসেই বলল, সকাল সকাল চা করে দে, চেমনা ফিরতে দেরি করছে।'

'তা দেরি হবে না!' চেমনা গজগজ করে উঠল। মাথা থেকে ধামাটা নামিয়ে নিচে রাখল। ঘিয়ের ভাণ্ডটা, কুন্তির হাতে দিল। 'চেমনা ফিরতে দেরি করছে, এটুখানি রাস্তা কিনা, না কি দুটো পাখা গজিয়েছে আমার, চাঁপাডাঙ্গার হাট থেকে উড়াল দিয়ে বাড়ি ফিরব?'

'চুপ চুপ।' ঠোঁটে আঙুল রাখল কুন্তি। 'চেঁচামেচি করবি না, বাড়িতে নতুন মানুষ এসেছে।'

'হুঁ, ভূষণার মুখে শুনলাম। একটা মেয়েছেলেকে মোটর বাইকের পেছনে বসিয়ে নিয়ে এসেছে।'

'আস্তে।' কুন্তি ফিসফিসিয়ে উঠল। 'মেয়েছেলে বলছিস কি —বৌ।'

'তোকে বলল একথা?'

কুন্তি ঘাড় কাত করল।

'এসেই বাবু আমার খোঁজ করল। চারদিনের মধ্যে তো আমার সঙ্গে কথা বলে না। আজ আমার ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে হেসে বলে এল, বাড়িতে বৌ এসেছে কুন্তি—তোরা একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলাফেরা করবি, ভাল করে কাজকর্ম করবি।'

'তারপর?' চেমনার চোখ কপালে উঠল। 'আর কি বলল?'

'বলল, চট করে উনুন ধরিয়ে ভাল করে দু কাপ চা করে দে— চেমনা আজ এত দেরি করছে কেন, সকাল সকাল রান্না নামাতে হবে। বেশি রাত করে ওর খাওয়া অভ্যেস নেই।'

'ওরে বাপ্।' গামছা দিয়ে চেমনা ঘাড় গলার ঘাম মুছে ফেলল। তারপর আর কথা বলছিল না।

কেরোসিনের ডিবিটা কাছে টেনে এনে কুন্তি ধামা থেকে সওদা-গুলি এক এক করে মাটিতে নামিয়ে রাখছিল।

'আচ্ছা, তুই আগে চা-টা তৈরী করে দিয়ে আয়।' একটু পরে চেমনা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'আমি মুখহাতটা ধুয়ে আসছি, তারপর রান্না চাপানো যাবে। হুঁ, তুই বরং ও ঘরে চা দিয়ে এসে এখানে বসে ততক্ষণ ময়দাটা ছানতে শুরু করে দে।'

অন্ধকার উঠোন পার হয়ে কুয়োতলার দিকে যেতে যেতে চেমনা অনেক কিছু ভাবছিল। আর তখন কেউ যদি রান্নাঘরে একবার উঁকি দিয়ে কুন্তির মুখটা দেখত। এই দু'দিনে গাল গলা যেন আরো শুকিয়ে গেছে। চোখের কোণায় কালি। চুলে তেল নেই, সেই কবে থেকে চিরুনির আঁচড় পড়ে না। টসটসে লাল ঠোঁট শুকনো বাঁশপাতার মতন চিপসে বিবর্ণ চেহারা ধরেছে। কিন্তু কালো চোখ দুটো? এখনো তাজা, এখনো জ্বল জ্বল করছে, মনে হচ্ছিল এক একবার বুঝি আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরোচ্ছে।

রাত একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল।

মাংস, ছোলার ডাল, চিংড়ির মালাইকারী, চাটনি, এতসব কি আর চট করে হয়। অথচ কোনোটাই না হলে চলবে না। বৌকে সব কিছুই খাওয়ানো চাই। কাজেই একটু বেশি রাত হলেও বাবু তেমন একটা রাগারাগি করল না। রাগারাগি করবে কি, দরজা জানালার

কপাট টেনে দিয়ে ভিতরে বসে দু'জনের হাসি গল্পগুজবই শেষ হচ্ছিল না। কেবল মাঝখানে আর এক কাপ করে চা তৈরী করে দিতে হয়েছে কুন্তিকে। ঢেমনার কিন্তু একবারও ডাক পড়েনি ওঘরে। যেন তাকে কোনো দরকারই ছিল না সেখানে। তার কাজ এঘরে। রান্না নামাল। 'একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে বল ঢেমনাকে'—কুন্তিকে দিয়ে বাবু দু'বার তাড়া লাগিয়েছে, তা না হলে খুব একটা আজ রাগারাগি করেনি।

এখন ওঘরের খাওয়া-দাওয়া শেষ। তখনো আলো জ্বলছে। তবে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকের দুটো জানালার একটা বন্ধ হয়েছে, একটা খোলা রাখা হয়েছে। হয়তো আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পরও ওটা খোলা রাখা হবে। হাওয়ার দরকার তো। 'ইলেকট্রিক আলো নেই, পাখা নেই এই যা অসুবিধা। তা না হলে গাঁয়ের মতন এমন সুখ তুমি পাবে না কোথাও।' খেতে বসে বৌকে নাকি বোঝাচ্ছিল বাবু। কুন্তি দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিল। কুন্তি শুনেছে। তারপর ঢেমনাকে বলেছে। হুঁ, কুন্তিকে আজ আর পরিবেশন করতে হয়নি। রান্না হবার পর ওঘরে টেবিলে সব দিয়ে এসেছে। দু'জনে নিয়েটিয়ে খেয়েছে। বাবু বৌ একসঙ্গেই খেতে বসেছিল। তা হলেও কুন্তিকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যদি কিছুর দরকার হয়। খাওয়া শেষ হতে এঁটো বাসনগুলি সরিয়ে কুন্তি টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে এসেছে। তারপর আর তাকে ওঘরে যেতে হয় নি। 'আর তোর দরকার নেই।' বলে বাবু নাকি রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দরজার পাল্লা দুটো টেনে খটাস করে ছিটকিনি তুলে দিয়েছে।

কুন্তি কিছুই খেল না। ঢেমনা দু-একবার সেধেছে। খিদে নেই বলে কুন্তি নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। লখিন্দরের মেয়ের খাওয়ার রুচি ক'দিন থেকেই ছিল না, আজ সে একেবারেই কিছু মুখে তুলবে না, কিছুই খেতে পারবে না, ঢেমনা কি আর বুঝতে

পারছিল না, খুব বুঝতে পারছিল। কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। তা হলেও রাত্রেই কুন্তিকে সে বুঝিয়েছে, 'এখান থেকে চলে যা, আর এখানে কিসের লোভে পড়ে থাকবি, বাবু বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসেছে, মানুষটা বদলে গেছে, খামকা তুই আর এখানে থেকে ঝামেলা পাকাবি না।'

'কিসের ঝামেলা শুনি।' কুন্তি এতক্ষণ মিনমিনে গলায় কথা বলছিল। হঠাৎ মুখটা বিকৃত করে এমন ঝামটা লাগাল, ঢেমনা রীতিমত ঘাবড়ে গেল। লখিন্দরের মেয়ের কালো চোখ দুটো সাপের চোখ হয়ে জ্বলছিল। 'ওঘরে শুতে গেছি? আমার মুখের ওপর দোর আটকে দিয়েছে, তুই কি দেখিসনি। তুই কি কানা।'

'আমি দেখিনি, তোর মুখে শুনলাম।' ঢেমনা মাথা গুঁজে পোড়া কড়াই খুন্তি ডেকচি হাতা একপাশে সরিয়ে রাখছিল। সকালে সব মাজতে হবে তাকে। 'তা হলে এবার খেয়ে নে।' ঢেমনা আর একবার সেধেছিল।

'উঁহুঁ, এবাড়ির জলটাও আমার গলা দিয়ে গলবে না, তুই বেশি কথা বলবি না, চুপ থাক।'

'তাই তো বলছিলাম, চলে যা এখান থেকে—এখন থেকে চাকরানি হয়ে থাকতে হবে তোকে এই সংসারে। আজ উনন ধরাতে বলেছে, কাল বাসন মাজতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাবু বলবে, বৌয়ের বাসি কাপড়চোপড় ধুয়ে দে।'

'ইস্ কত বড় আস্পর্দা—বৌয়ের বাসি কাপড় ধুয়ে দে।' কুন্তির নিশ্বাস থেকে আগুনের হলকা ঝরছিল। 'উঁহু, আমি যাব না, একটা হেস্তনেস্ত না করে এবাড়ি থেকে নড়ব না।' চাপা আর্তনাদের মতন গলার স্বর করছিল কুন্তি।

'কী আর হেস্তনেস্ত করবি—যা হবার তো হয়ে গেল।' ঢেমনা মাথা নেড়েছিল। 'বিয়ে থা করে বাবু এখন সংসার পেতে বসল, এরপর ছেলেপুলে হবে। এখানে আর থেকে তোর লাভ কী—হুঁ,

তবে কিনা, থাকতে হলে আমার মতন বাটনা বাটতে হবে, জল তুলতে হবে, রাঁধতে হবে—বাসন মাজতে হবে—'

'তুই চুপ কর, তুই থাম, তোর কথার কী দাম আছে।' রাগে দুঃখে কুন্তি তখন থর থর করে কাঁপছিল, যেন হঠাৎ কী করবে চিন্তা করতে পারছিল না। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরেছিল, পরক্ষণে এমন চোখ করে ঢেমনার দিকে তাকিয়েছিল যেন ছুটে এসে ঢেমনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথার চুল ছেঁড়ে—তাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। কিন্তু তখনই যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে একখণ্ড ঠাণ্ডা পাথরের মতন জমাট বেঁধে গেছে মেয়েটা, বোবা হয়ে গেছে। তার হাত পা নড়ছিল না, চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গিয়েছিল। যেন সে বুঝতে পেরেছিল, ঢেমনার কোনো দোষ নেই, তার ওপর রাগ করে কী হবে—দোষ তার ভাগ্যের। চোখের আগুন নিভে গিয়ে সেখানে জল চিক চিক করছিল। তারপর আর সে দাঁড়ায় নি। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঢেমনার খিদে পেয়েছিল। সে আর অনাহারে থেকে করবে কী। ডিবির সলতের গায়ে থোকা থোকা কালির ফুল জমেছিল। আঙুলের টোকা দিয়ে ফুল ঝেড়ে দিতে আলোর শিখা দপ্ দপ্ করে উঠল। এবার মাংসের বাটি, ডালের বাটি টেনে নিয়ে পরটা ছিঁড়ে সে খেতে আরম্ভ করল। কুন্তি খেল না। তার ভাগেরটাও সে খেয়ে নিল। নতুন বৌয়ের কল্যাণে খাওয়াটা ভালই হচ্ছে, চিন্তা করে ঢেমনা খুশী হতে চায়, কিন্তু পারল না, যেন তার চারদিকে পৃথিবীটা কেমন থম থম করছিল। যেন সে বুঝতে পারছিল, ধারে কাছে কোথাও একটা অশান্তি ওৎ পেতে আছে। উঁহুঁ অশান্তি না, একটা শয়তান। অর্থাৎ সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, নিমাইবাবু রাতারাতি এমন ভাল মানুষ হয়ে গল। বিয়ে করে সংসারী সাজল, না কি শয়তানের এ এক নতুন চাল।

রাত্রে মানুষটাকে দেখা হয়নি, পরদিন সকালবেলা বৌয়ের মুখ দেখে ঢেমনা স্তম্ভিত।

বৌ স্নান করবে। কুয়ো থেকে ঢেমনা বালতি বালতি জল তুলে আনছিল।

সেই যে ভেবেছিল, কাজ বেড়ে যাবে, তার খাটুনি বেড়ে যাবে। তাই তো হল।

ঘুম থেকে উঠেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ঢেমনার। আর মেজাজ খারাপের মুখে কিনা বাবুর নতুন গিন্নীর চেহারাটা দেখতে হল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গিন্নী টবের ফুল দেখছিল।

দাঁতে দাঁত চেপে থাকল ঢেমনা, গুম মেরে রইল কতক্ষণ। তার কপালের দু'পাশের রগ রক্ত জমা হয়ে ফেটে পড়ার উপক্রম করছিল। কান দিয়ে যেন ধোঁয়ার মতন কিছু বেরোচ্ছিল।

'জল আনা হয়েছে।' ঢেমনা জানিয়ে দিল। হাতে তোয়ালে সাবানের বাক্স নিয়ে তৈরী হয়েছিল গিন্নী। কথা না বলে উঠোনে নেমে ঝোপের ওপাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করা জায়গাটায় চলে গেল। আগে ওখানে কুন্তি স্নান করেছে।

ঢেমনা আর অপেক্ষা করল না। দুপদাপ করে বারান্দায় উঠে বাবুর ঘরে ঢুকল। মুখে সিগারেট গুঁজে বাবু আয়নার সামনে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল।

'এই তোর বৌ?' কোনোরকম ভূমিকা না করে ঢেমনা প্রশ্ন করল।

বাবু চোখ তুলে তাকাল, মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে হাসল।

'খুব অবাক হচ্ছিস মনে হয়।'

'না, অবাক হবার আছে কি!' ঢেমনা অন্যদিকে চোখটা সরিয়ে নিল।

'তোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবে, সংসারে এমন মানুষ আছে নাকি।'

'কী মুশকিল!' নিমাই ভুরু কোঁচকাল। 'বিয়ে করে বৌ ঘরে আনলাম, তাতেও তোর ঘ্যানর ঘ্যানর।'

'তোদের বিয়ে হয়ে গেছে? বুকে হাত দিয়ে একথা বলতে পারিস?'

'নিশ্চয়। দলিলপত্র আছে যে। যদি দেখতে চাস দেখাতে পারি। পরশু রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে এসেছি।'

আর যেন ঢেমনার মুখে কথা সরছিল না।

'কি, চুপ করে রইলি কেন।' নিমাই মিটিমিটি হাসছিল।

'বুড়ো কর্তাকে জানিয়েছিস তোদের এই বিয়ের ব্যাপার? তোর মা জানে?'

'জানাব, এত তাড়াহুড়োর আছে কী। বিয়ে যখন করেছি ছেলের বৌও তারা দেখবে।'

'ওফ্, ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—' ঢেমনা দূরে সরে দাঁড়াল। 'তোর নিশ্বাস গায়ে লাগা পাপ।'

'লাগাবি না, আমি তো বলেছি, এখানে তোর না পোষায় কলকাতা ফিরে যা।'

'যাব না।' ঢেমনা গর্জন করে উঠল। 'বলেছি, তোর শেষ না দেখে আমি এ বাড়ি থেকে নড়ব না। গিয়ে বুড়ো কর্তাকে তো আমায় একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে।'

'তোর কৈফিয়ৎ না পেলেও বুড়োর দিন কেটে যাবে।' নিমাই আয়নার দিকে চোখ নামাল। বিড় বিড় করে বলল, 'ক'দিনই বা বুড়ো আর আছে।'

'ইস্।' নিশ্বাস ফেলার মতন একটা শব্দ করল ঢেমনা। যেন

এর পর তার আর কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু না বলেও পারল না। 'তুই এত পশু, এমন জঘন্য, এতবড় কুলাঙ্গার।'

'এই ছ্যাখো।' নিমাই আয়না থেকে চোখ তুলল। 'জেলের মেয়েকে নিয়ে ছিলাম, আমার মান মর্যাদা কিছুই রইল না, সেদিন এত হৈ-চৈ করলি, আজ বিয়ে করে সংসারী হলাম, তোর গালাগাল থামল না।'

'বিয়ে করলাম, সংসারী হলাম।' চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল ঢেমনা। 'তা বলে একটা বেশ্যাকে বিয়ে করে তুই ঘরে আনলি।'

'আস্তে, এখনি চান করে ফিরবে ও।' চেহারাটা অতিরিক্ত গম্ভীর করে ফেলল নিমাই। একটু চুপ থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজাটা দেখল। তারপর ঢেমনার চোখে চোখ রাখল। 'তুই বেশ্যা বলছিস কাকে ?'

'বৌ হয়ে যে তোর ঘরে এসেছে।'

'সেলাই কলের কোম্পানীতে ও চাকরি করত, তুই সে খবর রাখিস ?'

'চাকরি করত কিনা জানি না, কিন্তু এই মেয়েকে নিয়ে তুই মদ খেয়েছিস, এই মেয়েকে নিয়ে হোটেলে ঘর ভাড়া করে ফুর্তি করেছিস, তুই নিজের মুখে স্বীকার করেছিস। সার্পেনটাইন লেনে মেয়েটা তোর গাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, আমি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। আমার চিনতে ভুল হয়নি নিশ্চয়ই ?'

'আমি তো বলিনি তুই চিনতে ভুল করেছিস। এই মেয়ে, হুঁ, এই মেয়েকে নিয়ে আমি বার-এ বসে মদ খেয়েছি, হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করেছি। একদিন না—অনেকদিন। তাতে হল কি। সেদিন সে আমার আমোদের সঙ্গিনী ছিল, আজ তাকে জীবনসঙ্গিনী করলাম।'

'তাই বলছি, তোর লাইন ঠিকই আছে—মাঝখান থেকে এখানে এসে একটা নিরীহ মেয়েকে, পাপ কাকে বলে যে জানত না—তার

জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললি, তাকে নষ্ট করলি, এখন ছিবড়ের মতন ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিস।'

'তোর কথা শুনলে হাসি পায়।' নিমাই একটু হাসল। 'ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি কোথায়? জলে না আগুনে? দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে, কাজ করছে, এই তো একটু আগেও আমাদের দু'জনকে চা করে দিয়ে গেল।'

দাঁতে দাঁত চেপে ঢেমনা চুপ করে রইল।

'কেন, সে কি তোর কাছে কান্নাকাটি করছে? আমি বিয়ে করে ঘরে বৌ এনেছি বলে লখিন্দরের মেয়ের খাওয়া দাওয়া ঘুম বন্ধ হয়ে গেল?'

'অনেকটা তাই, কাল রাত্রেও কিছু খায়নি।'

'কী দরকার এত কষ্ট করে এখানে থাকার, ভাল না লাগে বাপের কাছে চলে যাক।'

'তাই তো, তোর প্রয়োজন যখন শেষ হয়েছে তখন এ ছাড়া আর তোর বলার কী আছে—কিন্তু শোন্—' চোখ দুটো ছোট করে ফেলল ঢেমনা। 'যত সহজে সে এবাড়ি এসেছিল, এখন ফিরে যাওয়া তার পক্ষে তত সহজ নয়।'

'কেন?' নিমাই ভুরু কোঁচকাল।

'কলঙ্ক দুর্নাম।' ঢেমনা ছেড়ে কথা বলল না। 'তার সঙ্গে, তুই মনিব হয়ে বাবু হয়ে কী সম্পর্ক পাতিয়েছিলি গাঁয়ের মানুষের অজানা নেই। কাজেই মুখে এত কালি নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে এখন শক্ত হবে।'

'ছেলেমানুষের মতন কথা বলছিস।' গলায় ঢেউ তুলে নিমাই হাসল।

'মেয়েছেলের গায়ের কালি কতক্ষণ লেগে থাকে—তুই এই নিয়ে যতটা ভাবছিস, সে ততটা ভাবছে না। একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ—ধুয়ে ফেললেই কালি উঠে যায়—ঝিনুকডাঙ্গার বিলে দুটো

সাঁতার কেটে ডুব দিয়ে উঠুক, আবার তাজা টাটকা খাসা মেয়ে হয়ে যাবে, গাঁয়ের যে কোনো জোয়ান ছেলে লুফে নেবে।'

'নির্লজ্জ পশু!' মুখটা ফিরিয়ে নিল ঢেমনা। 'তোর ঐ চোখ দিয়ে, তোর মন নিয়ে তুই দুনিয়াটাকে বিচার করিস কি না, তাই তোর পক্ষে সবই সহজ, তুই সব পারিস, একটা বেশ্যাকে ঘরে আনতেও তোর আটকায় না।'

'এখান থেকে তুই বেরিয়ে যা, অকৃতজ্ঞ বেইমান।' চেয়ার থেকে নিমাই প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি অকৃতজ্ঞ, আমি বেইমান!' ঢেমনার গলার স্বর কেঁপে উঠল। কিন্তু আর একদিনের মতন হাউ হাউ করে সে কেঁদে উঠল না। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল না। একটা গরম নিশ্বাস ফেলে চৌকাঠের এপারে চলে এল।

এ কোন্ রহস্যের খেলা, এ কেমন হেঁয়ালি। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল ঢেমনার। তার ইচ্ছা করছিল তখনি ভাল করে কোথাও ডুব দিয়ে স্নান করে আসে। উঁহু, কুয়ার জলে না, কোনো বড় দীঘিতে নেমে স্নান না করলে যেন তার গায়ের ময়লা দূর হবে না, যেন তার গায়ে পোকা কিলবিল করছিল, অনেকক্ষণ পরিষ্কার জলের মধ্যে শরীরটা ভিজিয়ে না রাখলে পোকা ময়লা দূর হবে না।

কিন্তু ইচ্ছাটা সে দমন করল। এখনো হাতের কাজ বাকি, অনেক ময়লা তাকে ঘাঁটতে হবে। ঐ গিন্নী সকাল সকাল খেয়ে আজ আবার কলকাতা যাবে। আরও কি সব জিনিসপত্তর কেনাকাটা

বাকি। ফিরতে সন্ধ্যা হতে পারে, রাতও হতে পারে। কাজেই গা ঘিন ঘিন ভাব নিয়েই ঢেমনা এবেলার মতন দুজনের রান্না নামিয়ে দিল। ময়লা শরীর নিয়েই তো ঘেন্নার কাজ সারতে হয়।

'হুঁ, রাত্তিরে পরটা, মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা। আজ আর মুর্গী না, পায়রার মাংস হবে, আর আলুবোখরার চাট্‌নি।' বাড়ি থেকে বেরোবার আগে বাবু রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে ঢেমনাকে কথাগুলি শুনিয়ে গেল। ঢেমনাকে কাছে ডাকল না, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাবু কথা বলল না। যেন রান্নার জায়গাটাকে উদ্দেশ্য করে রাত্রের ভুরি ভোজনের ফর্দটা বাবু বড় গলায় আওড়ে গেল। ঢেমনার এক কান দিয়ে কথাগুলি ঢুকল, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

যাই বলো, বাবুর দয়ার শরীর। বেরোবার আগে কুন্তির ঘরের দরজার সামনেও কিন্তু একবার থমকে দাঁড়াল। কুন্তিকে ডাকল না, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লখিন্দরের মেয়েকে কিছু বলল না। তা হলেও ঘরের দরজাটাকে উদ্দেশ্য করে নিমাইবাবু জানিয়ে গেল, 'তোর মন খারাপ করার তো কিছু নেই, তুই যেমন ছিলি তেমন থাকবি—ঢেমনার সঙ্গে থেকে ঘরের কাজকর্ম করবি—জামাকাপড় যেমন পাচ্ছিলি পাবি—আর যদি মনে করিস অতিরিক্ত একটা মানুষ এসেছে, কাজ বেড়ে গেছে—এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরে লাভ কি, তোর টাকা বাড়িয়ে দেব, এমাস থেকে ডবল মাইনের টাকা পাবি—বুঝলি, মনে ফুর্তি নিয়ে কাজ কর।'

ঢেমনাও শুনল। রান্নাঘর থেকে কুন্তির ঘর তো খুব একটা দূরে না। কথাগুলি শুনে সে হাসল। শয়তান টাকা দিয়ে মানুষের মান অভিমান দুঃখ বেদনা লজ্জা অপমান—সব কিনে নিতে চাইছে, যেন টাকা ছিটোলেই পাকা আমলকীর মতন দুনিয়ার সবকিছু তার হাতের মুঠোয় এসে যায়।

কিন্তু কুন্তি কি একবার উঠল, দোর খুলে সামনে এসে দাঁড়াল?

চেমনা কান খাড়া করে রাখল। বন্ধ দরজা যেমন ছিল তেমন থেকে গেল। গিন্নীর হাত ধরে কর্তা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে বাগানের ওধারে মোটরবাইক স্টার্ট দেওয়ার ভট্‌ভট্‌ শব্দটা একবার শোনা গেল। তারপর শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

না, কুন্তি আর ওঠেনি। সকালে একবার রান্নাঘরের দিকে এসেছিল। দু কাপ চা করে দিয়ে সেই যে গিয়ে তার ছোট ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে, হয়তো শুয়েই আছে, চেমনা অনুমান করছিল। তারপর আর একবারও বাইরে তার মুখ দেখা যায়নি। তার মানে আজ মেয়ে শোয়া ছেড়ে আর উঠবেই না, স্নান করবে না, খাবে না চুল বাঁধা কাপড় ছাড়া, কিছুই করবে না।

একটা তেতো ঢোক গিলে চেমনাও চুপ করে বসে রইল। আর তার কিছু করবার ছিল না। উনন নিভিয়ে দিয়েছে। তা হলেও ঘরের ভিতর গরম লাগছিল, দাওয়ার কাছে সরে এসে একটা খুঁটির গায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে সে বসে রইল। রৌদ্র দেখছিল। আশ্বিনের রোদ আগুন ছড়াচ্ছিল। কোথায় যেন একটা টিকটিকি দু'বার ডেকে উঠে তারপর থেমে গেছে। কিন্তু শব্দ করছিল একটা ঘুণ পোকা। যেন চৌকাঠের কাঠ কুরে কুরে খাচ্ছিল আর একটা চাপা ঘুস্‌ঘুস্‌ শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

বলতে কি, দুপুরটা যেন রাতের চেয়েও বেশি থমথম করছিল। নতুন বৌকে নিয়ে শয়তান কলকাতা চলে গেছে। কিন্তু তার ছায়াটা যেন এখানে রেখে গেছে। ঘরের আনাচে কানাচে, উঠোনের এধার ওধার, লেবুঝোপের তলায়, কখনো বাগানের এপাশে ওপাশে ছায়াটা ঘুরঘুর করছিল। অদৃশ্য ছায়ার শব্দ শুনছিল চেমনা। শয়তানের নিশ্বাসের শব্দ তার কানে আসছিল।

তাই চেমনা ভাবছিল, বাইরে থেকে দেখলে মাথার ওপর আকাশটা কত প্রকাণ্ড, কেমন গাঢ় নীল ঝকঝকে—পাকা কাঁঠালের কোয়ার মতন রৌদ্রের কী চমৎকার সোনালী হলুদ রং, আর অফুরন্ত তাজা

টাটকা ফুরফুরে হাওয়া—ছ'মাসের রোগী শহর ছেড়ে এখানে এসে থাকুক, তিন দিনে শরীর ভাল হয়ে যাবে, গালে রং লাগবে, রক্তের জোর ফিরে পাবে। এই জন্যই বেলেঘাটার বুড়ো কর্তা এত নিশ্চিন্ত। কলকাতার আকাশে পোকা, বাতাসে পোকা, বেলেঘাটার আকাশে ধোঁয়া কালি, বাতাসে ময়লা। জলে হাজার ব্যারামের বীজ। দেশের গাঁয়ের চমৎকার জল হাওয়া গায়ে লাগিয়ে খোকা এতদিনে ভাল হয়ে উঠেছে, তার রোগ সেরে গেছে, এখন সে সবল সুস্থ তাজা মানুষ। মাছের চাষ করছে, ক্ষেত খামারের কাজ দেখা শোনা করছে।

ঠোঁটে একটা চেরা হাসি নিয়ে ঢেমনা এসব ভাবল, তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর তার কিছু করার নেই, সে অনেক করেছে এ পর্যন্ত, চাকর হয়ে খেটে খেটে এই ক'মাসে শরীরপাত করেছে। বলে কিনা, ভাণ্ডের ভিতরে যদি বিষ থাকে, ওপর থেকে ভাণ্ড ধোয়া মোছা ঘষা মাজা করলে কী হবে।

কাজেই যেমন ভাণ্ড তেমন থাকুক। ঢেমনার এবার বিদায় নেবার পালা। ঘিনঘিনে শরীরটা পরিষ্কার করার জন্য তার সেই কখন থেকে স্নান করতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু এখনো একটা ছোটো কাজ বাকি রয়ে গেল না?

বেলা যতটা চড়বার চড়েছে, এখন বুঝি গড়াবার পালা। রোদের চেহারা দেখে ঢেমনা বুঝল।

পশ্চিম সীমানার নারকেল গাছের ছায়া এবার উঠোনে বাড়তে আরম্ভ করেছে। আকাশে চিল দেখা গেল।

এক পা দু পা করে ঢেমনা কুন্তির ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল। লখিন্দরের মেয়ে সাড়া দিল না।

'শোন্', দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঢেমনা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বরং এখানে আমি এক বালতি জল এনে দেই—মাথাটা ধুয়ে ফেল।'

কুন্তি শব্দ করল না।

'মাথাটা ধুয়ে ছুটো ভাত খা, তোর জন্তে আমি আলাদা করে একটু মাছের ঝোল রেখে দিয়েছি।'

'আমি খাব না, আমি যাব না, চান করব না, তুই এখান থেকে এবার যা, আমায় বিরক্ত করিস না ঢেমনা।'

ঢেমনা চুপ করে রইল। একটু চুপ থাকার পর কুন্তি ভিতর থেকে শুধোল, 'তুই খেয়েছিস?'

'আমি খাব না। আমার খিদে নেই।'

'চান করেছিস?'

'উহুঁ,' একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে ঢেমনা বলল, 'আরো একটা ছুটো কাজ বাকি আছে। সব সেরে একেবারে চান করে গা হাত পা মুখ বেশ পরিষ্কার করে তারপর এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব।'

'হাটে যাবি?'

'উহুঁ,' ঢেমনা বাইরে থেকে মাথা নাড়ল। 'আমি চলে যাচ্ছি, আর এখানে থাকব না।'

এবার দরজাটা নড়ে উঠল। দরজা খুলে গেল।

'চাকরিটা ছেড়ে দিলি?'

ঢেমনা ঘাড় নাড়ল। হাঁ করে কুন্তির ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখটা দেখল, রুক্ষ এলোমেলো চুল বোঝাই মাথাটা দেখল, চোখের নিচের কালি দেখল।

'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন কী করবি?' শুকনো গলায় কুন্তি প্রশ্ন করল।

'কলকাতায় গিয়ে রুটির গাড়ি ঠেলব।' ঢেমনা অন্তদিকে চোখ ফেরাল। একটু চুপ থেকে পরে আবার কুন্তিকে দেখল। 'বুঝলি, একটা বেশ্যার ভাত রাঁধতে আমি এখানে থাকব।'

'কে বেশ্যা?' কুন্তি আঁৎকে উঠল না।

'বৌ, নতুন বৌ, বাবুর গিন্নী।'

কুন্তির চোখের পলক পড়ল না।

'আমার চোখে দেখা।' ঢেমনা বলল, 'এ মাগীকে নিয়ে তোর বাবু একসঙ্গে বসে মদ খেয়েছে,—হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করেছে, একদিন না অনেকদিন, এখন বলছে বৌ। বিয়ের আপিসে গিয়ে নাকি বিয়ে করেছে।

'ওফ্, কত বড় শয়তান!' দুর্বল শরীরটা নিয়ে কুন্তি দাঁড়াতে পারছিল না, চৌকাট ধরে বসে পড়ল।

'তাই তো বলছি, এখান থেকে চলে যা', ঢেমনা একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কুন্তিকে বোঝায়, 'এখন তুই বাবুর কাছে আখের ছিবড়ে ছাড়া কিছু না, আমি তো চললাম, তোকে দিয়ে রাঁধাবে, বাসন মাজাবে, বৌয়ের কাপড় কাচাবে।'

কুন্তি স্থির হয়ে বসে রইল। চোখটা মাটির দিকে। যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছিল।

'হুঁ, তবে কিনা', একটু চিন্তা করে ঢেমনা আবার বলল, 'বাবু বলে গেল শুনলাম, তোর টাকা বাড়িয়ে দেবে, ডবল মাইনে পাবি তুই এখন থেকে।'

'তার টাকায় আমি থুথু ফেলি।' বলতে বলতে কুন্তি সত্যি দাওয়ার সামনে খানিকটা থুথু ছিটিয়ে দিল, তারপর ক্লান্ত উত্তেজিত চোখ দুটো ঢেমনার মুখের দিকে তুলে ধরল।

'শোন', ঢেমনা একটা ঢোক গিলল, এদিক ওদিকে তাকাল, তারপর আবার নুয়ে কুন্তির মুখের কাছে মুখটা বাড়িয়ে দিল। 'কথাটা তোকে বলা হয়নি, কাল হাটে যাবার সময় ওদের সঙ্গে দেখা, পরাশর মদন রাসু নটবর—বাড়ি ফিরে শয়তানের নতুন কীর্তি দেখে, হুঁ, তার ঐ বৌটাকে দেখে মাথার ভেতরটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল, তাই তোকে বলতে ভুলে গেছি—মদনের দল ভয়ানক ক্ষেপে গেছে। ওরা চাইছে আজই তুই এই নরক ছেড়ে বাপের কাছে ফিরে যা।'

'আমি যাব না।' শুকনো চোয়াল দুটো শক্ত করে বলল লখিন্দরের মেয়ে। ঢেমনার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ওদিকের লেবুগাছটা দেখতে লাগল।

'কেন, যাবি না কেন!' ঢেমনা কপাল কোঁচকাল। 'এখানে, এই ঘেন্নার জীবন তোর ভাল লাগবে? একটা বেশ্যার ভাত রাঁধবি, রোজ ঘুম থেকে উঠে তার বাসি কাপড় ধুবি?'

কথা বলল না কুন্তি। তার চোখ ফেটে জল এল। ঢেমনা চট করে অন্যদিকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিল। নারকেল গাছের ছায়াটা বেশ লম্বা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

'শোন', একটু পরে ঢেমনা আবার কুন্তির দিকে মুখ ফেরাল। 'ওরা তোকে ভালবাসে, তোর ভালর জন্যই তোকে এ বাড়ি ছেড়ে যেতে বলছে, তা ছাড়া—তা ছাড়া, শুনলাম, আমি নিজের চোখেও দেখলাম, ঐ যে ছোঁড়া পরাশর, কেমন ভাসা ভাসা চোখ দুটো, বাঁশির মতন নাক, তোকে ভয়ানক ভালবাসে, লুকিয়ে লুকিয়ে তোর ছবি আঁকে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে কুন্তি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'কাজেই, আমার তো মনে হয়', ঢেমনা উপদেশ দেবার মতন করে বলল, 'তোর আজই এই পাপপুরী ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'

আরো কিছুক্ষণ কাঁদার পর হঠাৎ চোখ থেকে হাত সরিয়ে ফেলল কুন্তি। চোখে জল, তা হলেও কট্‌মট্ করে ঢেমনাকে দেখল। যেন ভেজা চোখ দুটো আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে দপ্‌দপ্ করতে লাগল।

'তুই এখান থেকে সরে যা ঢেমনা, আমি ভালয় ভালয় বলছি, আমার সামনে থেকে সরে যা, তোর চাকরি করতে ভাল না লাগে ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়—আমায় বিরক্ত করিস না। আমি কোথাও যাব না।'

'কেন?' গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল ঢেমনার। 'তা হলে তুই এখানেই পড়ে থাকবি?'

'উঃ আবার!' আর্তনাদের মতন শব্দ করল কুন্তি, কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

'তোর পায়ে ধরি ঢেমনা, আমার সামনে থেকে সরে যা, আমায় এভাবে তুই জ্বালাতন করিস না, আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই, আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'ওরা আসবে,' গম্ভীর গলায় ঢেমনা বলল, 'আজ সন্ধ্যের পর নটবর পরাশর মদন রাস্তু— সব দল বেঁধে বাড়ি চড়াও করবে, তারপর তোকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাবে।'

'না না না, আমি কিছুতেই যাব না,' যেন ভয় পেল কুন্তি, বাঁশ পাতার মতন ক্ষীণ শরীরটা থর থর করে কাঁপতে লাগল, কাঁপতে কাঁপতে কুন্তি মাটিতে বসে পড়ল, যেন শেষ রক্ত বিন্দু সরে গিয়ে মুখটা মোমের মতন সাদা হয়ে গেল। 'অ্যাঁ, ওরা কেন আসছে, ওরা কেন আমায় নিয়ে যেতে চাইছে, না আমি যাব না, এখান থেকে আমার যে একচুল নড়বার উপায় নেই। আমার কিছুতেই কোথাও যাওয়া চলবে না।'

'বেশ, তবে তুই থাক এখানে।' রাগ করে ঢেমনা দরজা ছেড়ে চলে আসছিল। বড় করে এক দলা থুথু ফেলল। আকাশের দিকে মুখ তুলে গজ গজ করে উঠল। 'যদি ঘেন্নার ভাত খেয়ে চাকরানি হয়ে একটা লম্পটের ঘরে সারাজীবন পড়ে থাকতে সাধ হয়ে থাকে, তো তাই থাকবি, আর আমার কিছু করবার নেই, বলারও নেই।'

'না না, তোকে কিছু করতে হবে না, বলতে হবে না, তোর পায়ে ধরি, তুই যা এখান থেকে, ওফ্ আমি যে আর পারি না'—বলতে বলতে লখিন্দরের মেয়ে এমন এক কাণ্ড করল, হঠাৎ কেমন বিমূঢ় স্তম্ভিত হয়ে রইল ঢেমনা, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, ঠকাস ঠকাস করে কুন্তি চৌকাঠের গায়ে কপাল ঠুকছিল।

'এই করিস কি!' আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না, ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেমনা মেয়েটার হাত চেপে ধরল, মাথাটা জোর করে চৌকাঠ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

'না না, আমায় বাধা দিস না। তুই সরে যা।' ধাক্কা দিয়ে ঢেমনাকে সরিয়ে দিল কুন্তি। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার। কপালটা কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোল, রক্তে চোখের জলে একাকার হয়ে ঠোঁট ভিজে গেল, চিবুক বেয়ে সেই রক্ত ও জল টপ টপ করে বুকের জামায় পড়ে বুক ভিজিয়ে দিল। হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক গোল উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তার চোখের তারা দুটো। ঢেমনা ভয় পেল। যেন পাগল হয়ে গেছে লখিন্দরের মেয়ে। অবিকল উন্মাদিনী মূর্তি। রুক্ষ এলোমেলো চুল কাঁধে বুকে কপালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুখটা আরো বীভৎস করে তুলেছে।

'এখানে থেকে এসব করে লাভ কী!' ঢেমনা আর বাধা দিতে গেল না। উদাস শুকনো গলায় ঘরের সামনের ডালিম গাছটার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগল। 'হাজার কপাল ফাটিয়ে রক্ত ঝরালেও শয়তানের মন গলবে না, লম্পট—তার চরিত্র পাল্টায় না, একটাকে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়ে আর একটাকে আমদানী করে।'

কথাগুলি হয়তো কুন্তি শুনল না। চোখ ট্যারা করে ঢেমনা দেখল চৌকাঠে আর কপাল ঠুকছে না ছুঁড়ি, মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। কাঁদুক। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঢেমনা দরজা থেকে সরে এল। সেই যে বলে, নতুন করে কথাটা ঢেমনার মনে পড়ল, আলোর কাছে পতঙ্গ ছুটে আসে, আলোর কিছুই হয় না, পতঙ্গের পাখা পোড়ে, ডানা ভাঙে, ঘাড় মচকায়।

আর সে দেরি করল না। বেলা প্রায় শেষ। এখন আর শুধু নারকেল গাছের সরু ছায়া না, ডালিম লেবু কামরাঙা গাছ—সব কিছুর ছায়া একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে উঠোনটাকে ঠাণ্ডা নরম করে দিয়েছে। শালিক বুলবুলি চড়ুই কিচিরমিচির করছিল। মাটির সব রোদ

এখন গাছের আগায়। শিকলের বাঁধন খুলে কুকুর দুটোকে সে রান্নাঘরের সামনে নিয়ে এল। ভিতর থেকে ভাতের হাঁড়িটা টেনে এনে সব ভাত উবুড় করে তাদের সামনে ঢেলে দিল। লেজ নাচিয়ে রাজা বাহাদুর চপচপ শব্দ করে ভাত খেতে লাগল। শূন্য হাঁড়িটা আবার ভিতরে ঢুকিয়ে ঢেমনা রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিল। বড় ঘর, অর্থাৎ বাবুর শোবার ঘরে ঢুকল সে। জানালাগুলি বন্ধ করল। পিছনের দরজা বন্ধ করল। তারপর বাইরে এসে সামনের দরজার পাল্লা দুটো টেনে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দিল। চাবিটা হাতে রাখল।

এবার সে নিজের ছোট ঘরটায় ঢুকল। না, এখন চান করবে না, এখানে জল কোথায়, কুয়োর জল গায়ে ঢালতে তার ইচ্ছা করছিল না। এই জলেও ময়লা আছে, পোকা আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় বড় দীঘি পুকুর দেখলে বেশ করে রগড়ে গা হাত পা মাথা পরিষ্কার করে নিয়ে কটা ডুব দিয়ে উঠবে। যাকে বলে গঙ্গাস্নান করা হবে। এবাড়ির জল ছাড়া দুনিয়ার সব জলই যে পবিত্র, গঙ্গা জলের সামিল, এটা সে বেশ বুঝতে পারছিল।

দড়িতে তার লুঙ্গি গামছা ময়লা ছেঁড়ামতন একটা পায়জামা ও শার্টটা ঝুলছিল। সব টেনে নামাল সে। বিছানার ওপর একসঙ্গে সব জড়ো করে রাখল। ছোট আরশি ও দাঁত ভাঙা চিরুনিটাও জামাকাপড়ের সঙ্গে বিছানার ওপর রাখল। এক টুকরো কাপড় কাচা সাবান ছিল, সেটাও সঙ্গে নিল। তার পর একসঙ্গে একটা বড় পুঁটলি করে সব বেঁধে নিল। না, আর কিছু নেবার নেই, চাকরের আর তেমন কী জিনিসই বা থাকে, বেতের সুটকেসটার দিকে চোখ গেল তার, ওটা বাবুর, ঢেমনাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিল— কাজেই ওটা সঙ্গে নেওয়া হবে না। ঢেমনা ঠিক করে ফেলল ওটা এখানেই পড়ে থাকবে। ঢেমনা উঠে দাঁড়ায়। আর একটা কাজ বাকি আছে।

পুঁটলিটা বগলে নিয়ে ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। দেখল গাছের আগায় এক ফোঁটা রোদের চিহ্ন নেই। ঝিঁঝি ডাকছিল। শালিকদের চেঁচামেচি একরকম থেমে গেছে। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। তার মনে হল, বাড়ি থেকে বেরবার উপযুক্ত সময়। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় হেঁটে স্টেশনে চলে যাবে। তবে কি না তেমন কোনো তাড়াও ছিল না তার। রাত আটটার ট্রেনও ধরতে পারে, আবার ভোরের দিকে যে ট্রেনটা কলকাতার দিকে যায় সেটাও ধরতে পারে ; যে কোনো একটা ট্রেনে চাপলেই হল। ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেই হবে, এক সময় স্টেশনে পৌঁছানো নিয়ে কথা।

হুঁ, একটা কাজ বাকি আছে। বাগানের মালিটাকে খুঁজছিল সে। ঘরের চাবিটা তার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। তবেই তার দায়িত্ব শেষ।

অর্থাৎ শেষপর্যন্ত ঢেমনা তার কর্তব্য পালন করে গেছে, নিমাইবাবু যাতে এটা বুঝতে পারে। ঘর খোলা ফেলে রেখে চাকর পালিয়ে গেছে, ঘরের এই জিনিস নেই, সেই জিনিস খোয়া গেছে, এমন অপবাদ পিছনে রেখে যেতে সে রাজি নয়।

'এই যে ভূষণা!' বাগানের কাজ সেরে খুরপি টুকরি হাতে ভূষণা উঠোনে পা দিতে ঢেমনা সেদিকে ছুটল।

'চাবি রাখ্।'

'কিসের চাবি!' অবাক হয়ে ভূষণা ঢেমনার বগলের প্রকাণ্ড পুঁটলিটা দেখছিল। 'কোথায় চললি তুই?'

'আমি চলে যাচ্ছি, কলকাতা যাচ্ছি, বাবুর ঘরের চাবি—নে রাখ্।' ভূষণার হাতে চাবির গোছা ছেড়ে দিয়ে ঢেমনা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলল।

ভূষণা আর শব্দ করল না। কেন না রাগী মানুষ ঢেমনা, বেশি কিছু বললে চটে যাবে, ভয়ে ভূষণা চুপ করে রইল। বাবুর সঙ্গে সকালে ঢেমনা রাগারাগি করেছে, চাকরি ছেড়ে দেবে সে, এমন একটা

কথাও ভূষণার কানে এসেছিল তখন। এখন সত্যি সে চলে যাচ্ছে দেখে ভূষণার খুবই দুঃখ হল। মানুষটা খাঁটি ছিল, বিশ্বাসী ছিল, কেন যে বাবুর সঙ্গে তার খটখটি বাধছিল, ভূষণা ভেবে পাচ্ছিল না।

ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে দেখছিল। মানুষটা চলে যাচ্ছে।

আর একজন চুপ করে তাকিয়ে দেখছিল। এতবড় একটা পুঁটলি বেঁধে নিজের জিনিসপত্তর নিয়ে ঢেমনা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে চুপ করে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কুন্তি। জেগে উঠে দেখছে ঘোর ঘোর সন্ধ্যায়, ভূষণা চাবি হাতে উঠোনে দাঁড়িয়ে আর ঢেমনা চলে যাচ্ছে। এই মাত্র বেরিয়ে গেল।

'কোথায় গেল রে ও?' উঠোনে নেমে কুন্তি ভূষণাকে জিজ্ঞেস করল।

'চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।' হাতের চাবিটা কুন্তিকে দেখাল ভূষণা। 'বাবুর ঘরের চাবি আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল।'

চুপ করে শুনল কুন্তি।

খাসা একটা দীঘি পেয়ে গেল ঢেমনা। দীঘির মতন দীঘি। অন্ধকার হয়ে গেছে। তা হলেও জল যেন আয়নার মতন চকচক করছে। নিশ্চয় জলের ওদিকটায় ওটা পদ্মবন কি শাপলাবন। থালার মতন গোল কালো কালো অসংখ্য পাতা জলে ভাসছে। অন্ধকারে অতদূর ভাল নজর যায় না। তবে শাপলা ফুল, পদ্মফুলের গন্ধের মতন একটা ঠাণ্ডা মিষ্টি গন্ধ ঢেমনার নাকে লাগল। দীঘির

পাড়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে গন্ধটা নিল ঢেমনা। অথচ তিনমাস যেখানে কাটিয়ে এল সেখানে ফুলের অভাব ছিল কি। শিউলি থেকে আরম্ভ করে কমল বেল টগর যুঁই রজনীগন্ধা—ফুলে ফুলে বাগান বোঝাই হয়ে আছে। না, এমন মিষ্টি গন্ধ ছিল না কোনো ফুলের। ওখানে যেন ঢেমনার মনে হত সব ফুল বিষ হয়ে গেছে—বিষের গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

পুঁটলিটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রেখে ঢেমনা গায়ের জামাটা খুলে ফেলল। তারপর পুঁটলির ভিতর থেকে গামছাটা টেনে বার করল।

গামছা পরে জলে নামবে সে ঠিক করল। কাপড় ভেজালে এখন শুকোবার অসুবিধা আছে।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

গামছা পরে জলের কিনারে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর প্রকাণ্ড আকাশটা দেখল সে। তারা ঝিকমিক করছে। ঘঙ ঘঙ করে একটা ব্যাঙ ডাকছিল। আর কোনো শব্দ ছিল না। সিল্কের রুমালের মতন নরম মোলায়েম বাতাস তার কান কপাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করছিল।

ঢেমনা জলে নামল। হাঁটু জল ছেড়ে কোমর জলে চলে গেল। আরো নেমে গেল। গলা ডুবল। কান ডুবল। এবার সে ছোটখাট একটা সাঁতার কাটল। তারপর ডুব দিল। একবার দু'বার তিনবার…। ডুব দিয়ে তীরের কাছে চলে এল। তার মনে হল তিনমাসে তার গায়ে যত ময়লা জমেছিল, সব ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। হালকা ঝরঝরে লাগছিল শরীরটা। যেন সে এবার কত মুক্ত, কত পবিত্র হল। গঙ্গা গঙ্গা—বলতে বলতে সে তীরে উঠে এল।

হুঁ, ঠিক এমন সময় একটা সোরগোল কানে এল তার। বেশ দূর থেকে গোলমালটা আসছে। চোখ তুলল সে। দেখল পূবদিকে পুরোনো একটা অশ্বত্থ গাছের পিছনে, না আরো দূরে ওদিকের

খেজুরবন আমবনের পিছনে আকাশটা লাল হয়ে গেছে। সেদিক থেকে গোলমালটা আসছে।

এখন ঢেমনা বুঝতে পারল। মদন পরাশর ওরা মশাল নিয়ে, সড়কি বল্লম লাঠি দা নিয়ে নিমাইবাবুর বাড়ি চড়াও করেছে। তারা লখিন্দরের মেয়েকে শয়তানের খপ্পর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। কেউ বাধা দিলে রক্ষা নেই, তখুনি ধড় থেকে মাথা আলগা হয়ে মাটিতে খসে পড়বে।

একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে ঢেমনা দশটা তাগড়া জোয়ান গলার হৈ-রৈ শুনল, আম খেজুর বনের পিছনে চমৎকার লাল আগুন দেখল।

'যাক গে. এবার তো সোনা ঘরে ফিরে না গিয়ে পারবে না। দশটা জোয়ানের সামনে গাঁইগুঁই চলবে না।' ভাবল ঢেমনা, ভেবে নিজের মনে হাসল। তারপর নুয়ে হাত বাড়িয়ে ঘাসের ওপর ছেড়ে রাখা শুকনো কাপড়টা তুলতে গিয়ে সে চমকে উঠল। তার পুঁটলিটা ঘেঁষে যেন আর একটা পুঁটলি হাতে চুপ করে অন্ধকারে একজন বসে আছে।

'কে!' গলার স্বর কেঁপে উঠল ঢেমনার. তাহলেও কঠিন শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। 'কে তুই?'

'আমি।' ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল।

'কুন্তি!' ঢেমনা বোকা হয়ে গেল। 'তুই এখানে?'

'আমি চলে এসেছি, পালিয়ে এসেছি ওবাড়ি থেকে।'

'পালিয়ে এসেছিস! কোথায় তা হলে যাবি এখন?' ঢেমনা ঝুঁকে দাঁড়াল।

'কোথাও না', যেন তখনো হাঁপাচ্ছিল মেয়ে। 'আমি তোর কাছে এসেছি, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই।'

'সে কি!' পায়ে মাথায় শিউরে উঠল ঢেমনা। 'আমার কাছে এসেছিস অর্থ কি, আমি তোকে কোথায় নিয়ে যাব।'

'আমি জানি না, আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।' কুন্তি কাঁদতে লাগল।

চুপ করে রইল ঢেমনা। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। গলার কাছটা বড় বেশি তেতো লাগছিল। চোখ তুলে তারাভরা আকাশ দেখল সে। চোখ নামিয়ে দীঘির ছলছল জল দেখল। দূরের অন্ধকার গাছপালার জটলা দেখল।

'কিন্তু কথা হচ্ছে কি—' কুন্তির দিকে ঘাড় ফেরাল ঢেমনা। 'ওরা তোকে নিয়ে যেতে এসেছে, মদন, পরাশর, নটবর—ওরা তোকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেত, হুঁ, পরাশর—ভীষণ ভালবাসত—ছোঁড়া তোকে, এখনো ভালবাসে।'

'না, না না—' কুন্তি আবার বসে পড়ল, ঢেমনার হাঁটু দুটো শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। 'ওরা আমায় নিয়ে গিয়ে কী করত, আমি যে ফুরিয়ে গেছি, আমি যে শেষ হয়ে গেছি ঢেমনা!'

'কিছুই ফুরোসনি, কিছুই তোর শেষ হয় নি।' সান্ত্বনা দিতে ঢেমনা তার মাথায় হাত রাখল। 'ওরা তোকে খুব ভালবাসে।'

'না না—' ভীত ক্লান্ত গলার কান্না কিছুতেই থামছিল না। পা দুটো ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল ঢেমনা, কিন্তু লখিন্দরের মেয়ে আরো শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, যেন এমন ভাবে ঢেমনাকে ধরে না রাখলে সে পড়ে যেত, ডুবে যেত, যেন কোন অন্ধকার পাতালে তলিয়ে যাচ্ছিল মেয়ে।

'কী হয়েছে তোর শুনি?' রুক্ষ কঠিন গলায় ঢেমনা চিৎকার করে উঠল, যেন আর তার ধৈর্য থাকছিল না। চান করে উঠেও কিনা তার কপাল পিঠ ঘামছিল। 'এমন করছিস কেন!' মুখটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল ঢেমনা।

'শয়তান···শয়তান···শয়তান···' অপ্রতিরোধ্য কান্নার আবেগে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল কুন্তির স্বর, তাহলেও ঢেমনা শুনল। বুঝল। পা দুটো হিম হয়ে গেল। কেউ যেন দশ মণ পাথর চাপিয়ে দিল

তার মাথায়। ঢেমনা বসে পড়ল। মেয়েটাকে অন্তঃসত্ত্বা করে ছেড়ে দিয়েছে শয়তান।

'তুই আমায় বাঁচা......তুই ছাড়া আমার কেউ নেই ঢেমনা।' তার কোলে মাথা রেখে কুন্তি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। ঢেমনা উঠল না, নড়ল না। ফ্যালফ্যাল করে পূবের আকাশটা দেখছিল। আগুন নিভে গেছে। প্রকাণ্ড একটা চাঁদ উঠছিল খেজুরবনের পিছনে।
